হারিয়ে পাওয়া

সমরেশ বসু

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৭১

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৯

চাঁদ বাড়ি ফিরছিল।

এই যদি শীতের দিন হত, এখন তাহলে রীতিমত অন্ধকার হয়ে আসতো। কিন্তু তার মধ্যেও একটু আরাম থাকত। গোটা শরীরটা এরকম হেজে পচে থাকত না।

হ্যাঁ। এ অবস্থাটাকে হাজা পচাই বলে। 'মাহ ভাদর' কথাটা বৈষ্ণব কবিতাতেই ভাল লাগে। 'ই ভর বাদর, মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।'···কবিতাটা এখনো পরিষ্কার মনে আছে। সুকুমার সেনের 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' বই পড়তে গিয়ে কবিতাটা মুখস্থ হয়েছিল। বাংলায় অনার্স ছিল ওর। কথাটা এখন মনে পড়লে, নিজেকেই বিদ্রূপ করতে ইচ্ছা করে। পুরনো দিনের অনেক কথাই এখন, বিদ্রূপ আর ঠাট্টা বলে মনে হয়। নিজেকে সার্কাসের জোকারের থেকেও বেশি করুণা করতে ইচ্ছা করে। তা না হলে, বাংলায় অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করে, অস্ত্র কারখানার বেয়নেট বিভাগে কেউ চাকরি করে?

চাঁদ অবিশ্যি এসব কথা ভেবে, মন খারাপ করতে চায় না। ও কারখানায় শ্রমিকের কাজ করে বটে, কিন্তু ইস্কুল মাস্টারি কিংবা কলেজের লেকচারার, শুনতে বেশ গালভারি কথা, আসলে ছুঁচোর কেত্তন। সার হল কোঁচার পত্তন। ও যা মাইনে পায়, তা একজন ইস্কুল মাস্টার বা লেকচারারের থেকে বেশি। তবে এ দেশে, যে কলেজে পড়ায়, সে-ই নাকি অধ্যাপক, মানে প্রফেসর।

না, চাঁদ আপাততঃ এসব কথা ভাবতে চায় না। গোটা শরীরটা এখন জ্বালা করছে। মনে হচ্ছে যেন চামড়ায় অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়েছে। শার্টের ভিতরে গেঞ্জিটা সকাল থেকে একবারও শুকোবার অবকাশ পায়নি। সেই সাতসকালে স্নান করে, গায়ে ছিটেফোঁটা পাউডার ছড়িয়ে গেঞ্জি পরেছিল। তারপর থেকে সেটা ভিজেই

আছে। হাফশার্টের ওপর রীতিমত ভেজা আর নুনের সাদা খড়ি দাগ পড়ে গিয়েছে। সার্টের এই দাগগুলো দেখলেই মনে হয়, বাচ্চা ছেলের হিসির দাগ। গরম কালটা ওর ছু চক্ষের বিষ।

চাঁদের মনে সেইজন্যই, বিশেষ করে এই বৈষ্ণব কবিতাটাই মনে পড়ছে। সময়টা ভাদ্র মাস। ইংরেজিতে কি একেই লংগেস্ট ডে বলে নাকি? বাংলায় যে এ সময়টা দীর্ঘতম দিন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দীর্ঘতম, উষ্ণতম, ভ্যাপসাতম—। কথাটা মনে হতেই, চাঁদ নিজের মনেই হেসে উঠল। ভ্যাপসাতম বলে কোন কথা আছে নাকি? মনে মনে ভাবলেই হল, কে শুনতে যাচ্ছে? মোটের ওপর, এই সময়টা ওর কাছে জঘন্যতম। জ্যৈষ্ঠ মাসে ওর গায়ে একটিও ঘামাচি বেরোয় না। কিন্তু এই ভাদ্র মাসে বেশ কিছু ঘামাচি বেরিয়েছে। প্রত্যেক বছরেই এ সময়ে ওর গায়ে ঘামাচি বেরোয়। ঘাম জমে জমে, বেশ বড় বড় লাল গোটা, মশার কামড়ের মত ঘামাচি।

এ সময়ে দিন বড়, রাত্রি ছোট। মাথার ওপরে পাখা ঘুরলেও, ওদের এই মফস্বল শহরে মশারি টাঙাতেই হয়। গরমে ঘুম আসতে চায় না। ঘুম যখন আসে, তখনই ওঠবার সময় ঘনিয়ে আসে। ছু চোখ ভরা ঘুম আর ক্লান্তি নিয়েই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে, চান করে খেয়ে ছুটতে হয় স্টেশনে। ট্রেন ধরে চাকরি স্থলে। ট্রেনে বসতে পাওয়ার জায়গা আর লটারির টিকেট পাওয়া, প্রায় এক রকম। খেয়ে আরাম নেই, শুয়ে শান্তি নেই, সারাদিন ঘেমে ঘেমেই কাজের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়। আর এই ভাদ্দর মাসেই কী না কবিকল্পনায় হয়ে ওঠে, 'ঝম্পি, ঘন গরজান্তি, সন্ততি ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া/কান্ত পাহুন, কাম দারুণ, সঘন খর শর হন্তিয়া/কুলীশ কত শত, পাত্র মোদিত, ময়ুর নাচত মাতিয়া/মত্ত দাতুরি, ডাকে ডাহুকি, ফাটি যায়ত ছাতিয়া'...। বৃষ্টি নামলেই বা কী? গরম কি কমে? হ্যাঁ, ব্যাঙের ডাক অবিশ্যি প্রচুর শোনা যায়। বাড়ির আশেপাশে গোটা ছুই পুকুর ডোবা আছে। কিন্তু ময়ূরের নাচ? গায়ে জ্বালা ধরে যায়! কোন সুখে যে রাধার

তখন কান্তর জন্য কাম উপস্থিত হয়, চাঁদের মাথায় আসে না। কোন কোন ছুটির দুপুরে, আচমকা ডাহুকির ডাক শুনলে অবিশ্যি প্রাণটা কেমন করে ওঠে। মনটা সত্যি কেমন খা খা করে, নিজেকে খুব একা একা লাগে। তাও যদি বউদির মেজাজ ভাল থাকে।

হ্যাঁ, এই আর এক উপসর্গ। যত গরম গুমসোনি, বউদির মেজাজ তত চড়া। চাঁদের সঙ্গে তেমন লাগে না। দাদার সঙ্গেই লাগে। কেন যে লাগে, আর কী করে লাগে, আজ পর্যন্ত চাঁদ কিছুতেই ঠিক মত বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু লেগেই আছে। যেমন দাদা, তেমনি বউদি। দুজনেই সমান। এর আর ওর, দুজনেরই পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষা নেই। বাজার করা নিয়ে, জমাদার খাটানো নিয়ে, ধোপা-বাড়ির কাপড় কাচা নিয়ে, রান্না নিয়ে, কী নিয়ে যে লাগে না তা বলা যায় না। অথচ সমস্ত ব্যাপারগুলোই খুব সামান্য। দু-এক কথাতেই শেষ হয়ে যেতে পারে। তা কখনোই হবে না।

চাঁদ যদি দুজনের মাঝখানে কথা বলতে যায়, তখন দুজনেরই আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে ও। যত অপরাধ, তখন ওর। ও নাকি চাকরি করে দাদা-বউদির মাথা কিনেছে। কুটোগাছটি নাড়তে পারে না। অথচ বিয়ে করতে বললে, ও বোবা হয়ে থাকবে। এ খোঁটাটা বউদিই বিশেষ করে দেয়। কারণ তার দু দুটি আইবুড়ো বোন রয়েছে। তাদের বিয়ের সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে। চাঁদকেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কয়েকবার। চাঁদ ওসব থেকে শতহস্ত দূরে। বিয়ে? তাও আবার বউদির বোনকে! এক চোপাতে রক্ষা নেই, সঙ্গে আবার সহোদরার চোপা? বাড়িতে কাক-পক্ষী বসতে পারবে না! চাঁদ অবিশ্যি এভাবে বউদিকে বলে না। মনের কথাটা যদিও তা-ই। ও শেষ পর্যন্ত দাদা-বউদিকে ক্ষ্যাপা-ক্ষেপী নাম দিয়েছে। তবে মনে মনে। বউদিকে যদিও বা মুখের সামনে দু-একবার ক্ষেপী বলেছে, দাদাকে বলা অসম্ভব। দাদা ওর থেকে প্রায় দশ বছরের বড়। এখনো কান মুলে থাপ্পড় মারতে আসে। মুখের সামনে ক্ষ্যাপা বললে, মেরে পাট

পার্ট করবে। ও দাদাকে এখনো রীতিমত ভয় পায়। মুখে যত যা-ই বলুক।

চাঁদ আসলে মনে মনে হেসেই, দাদা-বউদিকে ক্ষ্যাপা-ক্ষেপী বলে। বলে, নিজের মনেই আনন্দ পায়। দুজনকে ওর ছেলেমানুষ মনে হয়। সে কথা মুখের সামনে বললে রক্ষা নেই। কিন্তু এই বউদিই হয়তো অন্যরকম হত, যদি একটা ছেলেমেয়ে কিছু হত। সাত বছর হল বিয়ে হয়েছে, এখনো একটি সন্তানের দেখা নেই। কথাটা মনে হলে, চাঁদ খুব বিমর্ষ হতাশ হয়ে পড়ে। দাদা-বউদির স্বাস্থ্য ভাল। বউদিকে দেখতে এখনো বেশ ঢলঢলে, টলটলে। বয়সের তুলনায় অনেক কাঁচা দেখায়। দাদার অবিশ্যি চুলে কিছু পাক ধরেছে। সেটা বয়সের জন্য না, কিছুটা বংশগত। বাবা বলতেন, 'বাইশ বছরের ছেলে বিয়ে করতে গেলুম, মাথার চুলে তখন বেশ পাক ধরেছে। বাইশ বছর বলে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইত না। নেহাত হরি ভট্‌চাজের নিজের হাতে তৈরি কুষ্টিটা ছিল, তাই রক্ষে।'

সেই তুলনায়, চাঁদ ওর মায়ের দিকটা পেয়েছে। এই সাতাশ বছর বয়সে, এখনো ওর মাথায় পাকা চুল দেখা দেয়নি। মাকে ওর তেমন ভাল মনে নেই। ওর চার বছর বয়সে মা মারা গিয়েছেন। বাবা মারা গেলেন বছর তিনেক আগে। তাঁর সাদা ধবধবে মাথা ছিল। শেষ বয়সেও বাবার মাথায় বেশ চুল ছিল। বাবার কথা মনে পড়তেই, আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। এই ভাদ্র মাসে বাবা বলতেন, 'আকাশটা উনোনের ছাই দিয়ে চাপা রয়েছে।'

কথাটা ভেবে দেখবার মত। গুমসোনি আর গরম, ওই কথাতেই বোঝা যায়। এ সময়টায় চাঁদের কাছে একমাত্র শান্তি সন্ধ্যেবেলা স্নান করে, বকুলতলায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। কাছেই ক্লাব-ঘর। ঘরে কেউ বসে না। একশো পাওয়ারের বাল্ব, লম্বা তারের সঙ্গে টেনে বকুলগাছের নিচু ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বাইরে বসেই তাস আর দাবা খেলা যায়। যার ইচ্ছা হয়, সে সামনেই পালেদের ঘেরা মাঠে বসে গল্প-

সহ্য করতে পারে।

'এই চাঁদ!' রাস্তার ধারে চায়ের দোকানের বাইরে কয়েকটি যুবকের মধ্যে একজন ডেকে বলল, 'আমার মাসীমাকে নিয়ে আজ আসব নাকি?'

চাঁদের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল। বলল, 'আজ কেন, বলেছি তো রোববার সকালে নিয়ে আসবি।'

'মাসীমা একটু তাড়া দিচ্ছিল।' যুবকটি বলল, 'আসছে হপ্তায় কলকাতায় চলে যাবে কী না, তাই।'

চাঁদ তাতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত না হয়ে বলল, 'রোববার সকাল ছাড়া হবে না ভাই। সারাদিন কারাখানা ঠেঙিয়ে এসে, এখন আমি ওসব পারব না।'

ও না দাঁড়িয়ে বলতে বলতেই এগিয়ে চলল। অন্য একটি যুবক বলল, 'খুব ডাঁট নিচ্ছিস মাইরি চাঁদ।'

চাঁদ রেগে উঠে ফিরে দাঁড়াল। যুবকটি তৎক্ষণাৎ হেসে উঠে, হাতজোড় করে বলল, 'রাগিস না মাইরি, একটু ঠাট্টা করলাম। আজ রাবে আমার হাতটা একটু দেখে দিস।'

চাদ কোন জবাব না দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। বন্ধুটি যে ঠাট্টা করেছে, তা ও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এখন কিছুই সহ্য হচ্ছে না। জামা প্যান্ট জুতো মোজা খুলে, যতক্ষণ না একটু পাখার তলায় বসা যাচ্ছে, ততক্ষণ শান্তি নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে ও নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছে। কোন এক কুক্ষণে যে ও জ্যোতিষী চর্চা শুরু করেছিল, নিজেই জানে না। নিতান্ত শখ করেই,

চর্চা আরম্ভ করেছিল। আর এ বিষয়টি এমনই, আপন মনে চর্চা করলেই চলে না, বিদ্যাটা লোকের ওপর না ফলালে, ফল পাওয়া যায় না।

প্রথম প্রথম বন্ধুদের হাত দেখা দিয়ে শুরু করেছিল। তারপর কোষ্ঠী নিয়ে চর্চা আরম্ভ করেছিল। এ বিষয়ে ওর গুরু হলেন বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য। ফলটা ভালই হয়েছিল। মোটামুটি ওর হাতের রেখা আর কোষ্ঠী গণনা বেশ নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তার ফলে যা হয়, তাই হয়েছে। এখন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার অবস্থা। এক সময়ে যা ছিল শখ, এখন তা হয়ে উঠেছে হাতের বেড়ি। ওর আর সব পরিচয় সবাই ভুলে যেতে বসেছে। সবাই আসে হাত দেখাতে, কোষ্ঠী গণনা করাতে। সময় নেই, অসময় নেই, 'চাঁদ ভাই একটু হাতটা দেখবি?'

এখন আর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ নেই। বড়রাও ওকে রীতিমত খাতির করে। বাইরে থেকে মহিলা পুরুষরা পর্যন্ত আসে। ওর সুনামটি বেশ প্রচারিত হয়েছে। এখন গ্রহ-রত্ন ধারণের পরামর্শও দিয়ে থাকে। ওই বন্ধুটি যেমন তার মাসীমার কথা বলল, তেমনি অনেকেই তার আত্মীয়-স্বজনদের ওর কাছে নিয়ে আসে। দাদা-বউদি বলে, 'বাড়ির দরজায় আর একটা সাইনবোর্ড টাঙানো বাকী থাকে কেন? ওটাও হয়ে যাক।'

কথাটা একেবারে মিথ্যে না। ওর গুরু, আর দাদা বউদিরও বক্তব্য, এখন থেকে জ্যোতিষীর জন্য টাকা-পয়সা নেওয়া উচিত। চাঁদের পক্ষে সেটা সম্ভব না, কারণ ওর মনের দিক থেকে একেবারেই সায় নেই এমন কি সাইড বিজনেস হিসাবেও, এ বিষয়টাকে ও নিতে পারবে না। নিজেকে ও পেশাদার জ্যোতিষী কখনো ভাবতে পারে না। কিন্তু বিদ্যা-টাকে ও ভালভাবে চর্চা করে, আরো ভাল করে আয়ত্ত করতে চায় অনেকে মিষ্টির প্যাকেট, ফলের ঠোঙা নিয়ে আসে। ও রীতিমত অস্বস্তি আর লজ্জা বোধ করে। ও পরিষ্কার বলেই দেয়, এ সব যেন কেউ না আনে। কিন্তু কে ওর কথা শুনছে। সব থেকে জ্বালাতন করে শহরের

মেয়েগুলো। বিশেষ করে কলেজে পড়া মেয়েগুলো। কবে থেকে যে ও সকলের পেয়ারের চাঁদদা হয়ে গিয়েছে, নিজেই জানে না। দল বেঁধে সবাই আসে হাত দেখাতে। লেখাপড়া কেমন হবে, সেটা হল মুখের জিজ্ঞাসা। আসল প্রশ্নটা সকলেরই ভিন্ন, আর একটিই মাত্র প্রশ্ন, বিয়েটা কবে হবে, বরটি কেমন হবে। তার চেহারা ভাল হবে কী না, টাকা-পয়সা থাকবে কী না, এই সব।

কিন্তু শত হলেও মেয়ে তো। সরাসরি জিজ্ঞেস করে না। কেউ বলে, ভবিষ্যৎ কেমন হবে, ভাগ্যে কী আছে। আবার একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'দেখুন তো চাঁদদা, ওর বিয়ে কবে হবে। কেমন বিয়ে হবে?'

অবিশ্যি সব মেয়েকেই চাঁদের খারাপ লাগে না। কিন্তু এ নিয়ে দাদা-বউদি তো পেছনে লাগেই, বন্ধুরাও কেউ কম যায় না। কেউ কেউ ওর হাতটা টেনে নিয়ে টিপে বলে, 'দে গুরু, তোর হাতটা টিপি। অনেক মেয়ের হাতের ছোঁয়া তোর হাতে লেগে আছে।'

চাঁদ চলতে চলতে হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়াল। ও বাড়ির পথটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য, মিত্তিরদের বাগানের ভিতর দিয়ে, পায়ে চলা পথের দাগের ওপর দিয়ে চলছিল। স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে, ওদের পাড়ার সবাই প্রায় এ পথ দিয়েই যায়। আম জাম নারকেল ইত্যাদি ফলের বাগানটা এককালে বেশ ভালই ছিল। তখন চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন নানা জায়গায় পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। অনেক গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

চাঁদ মাটিতে একটা জিনিস দেখে থমকিয়ে দাঁড়াল। নিচু হয়ে বস্তুটিতে হাত দেবার আগে, কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে দেখল। চোখের সন্দেহটা দৃঢ় হল, নেহাত বাজে কিছু মনে হল না। ও নিচু হয়ে, পায়ে চলা পথের ধার ঘেঁষে, ঘাসের ওপর থেকে চকচকে বস্তুটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখল। মেয়েদের কানপাশা। সোনা চিনতে চাঁদের অসুবিধা হল না। ছিলে-কাটা, নতুন তৈরি সোনার কানপাশার মাঝখানে একটি

পাথর। পাথরটি পোখরাজ অথবা হীরে, ও বুঝতে পারল না। যাই হোক, সেটি খুব ছোট না, এবং তার চারপাশে ছোট পুঁতির মত বিন্দু বিন্দু মুক্তো দিয়ে ঘেরা। চাঁদ মুক্তোগুলো চিনতে পারল। অলঙ্কারটির গড়ন বেশ সুন্দর। দেখলেই বোঝা যায়, ভাল শিল্পীর দ্বারা তৈরি।

চাঁদ তথাপি কানপাশাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, সোনা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হল। নকল আসল দেখলেই, কিছুটা বোঝা যায়। ও বাগানের আশেপাশে একবার তাকিয়ে দেখল। কেউ নেই, একমাত্র ধোপা বুড়িটা আর গোটা দুই গরু ছাড়া। ধোপা বুড়িটা গাছের শুকনো ডালপালা কুড়োচ্ছে। কিন্তু এরকম একটা জিনিস এখানে এল কী করে?

চাঁদ কানপাশাটা পকেটে রেখে, নিচে ধুলা আর ঘাসের আশেপাশে দেখল। তারপরে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করল। এ পথে মেয়েদেরও চলাফেরা আছে। জিনিসটা যদি খাঁটি হয়, তাহলেও ভাববার বিষয়। নিশ্চয়ই কারোর হাত বা ব্যাগ থেকে এরকম পড়ে যেতে পারে না, কান থেকেই খুলে পড়েছে। কিন্তু পড়ে কী করে? কান থেকে এরকম একটা কানপাশা খুলে পড়ে গেল, আর সেই মেয়ে বা বউ, যে-ই হোক, মোটে টের পেল না? এত আত্মভোলা মেয়েরা কখনও হয়?

প্রেম করতে এসেছিল নাকি মিত্তিরদের বাগানে? সেরকম সুযোগ-সুবিধা এখানে তেমন নেই। কারণ প্রায় সর্বদাই লোকজন চলাফেরা করে। ভরদ্বপুরের কথা অবিশ্যি বলা যায় না। আজকাল প্রেমের জায়গার অভাব বড় বেশি। লোকের বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করতে হয়! চাঁদের কাছে এটাও একটা সমস্যা। কোন মেয়ের সঙ্গে যদি কখনো প্রেম হয়, প্রেম করার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? বাড়িতে তো অসম্ভব। বউদি একাই একশো। বাইরে ঘুরে ঘুরে প্রেম করা, ভাবতেই ওর লজ্জা করে। অবিশ্যি লোকে বলে, গাই-বাছুরে ভাব থাকলে, বনে গিয়ে দুধ দেয়। তা না হলে, রামবাবুর রেস্টুরেন্টকে সবাই বৃন্দাবন বলত না। গাই-বাছুরের বন হল সেই জায়গা। পায়রার খোপের মত কেবিন করেছে, আর তার গায়ে দম চাপা চটের মত পর্দা ঝুলছে।

মাথায় লেখা, ফ্যামিলি। চাঁদ যখনই রামবাবুর রেস্টুরেণ্টে গিয়েছে, তখনই দেখেছে, অধিকাংশ খুপরিগুলোর পর্দা ঢাকা। ভিতরে যারা আছে, তাদের পা দেখা যায়। ছেলেদের ট্রাউজার আর মেয়েদের শাড়ির পাড়। মেয়েদের পা দেখলেই বোঝা যায়।

চাঁদের তবু অবাক লাগে। রামবাবুর রেস্টুরেণ্টের পাখার যা অবস্থা, ওই সব পর্দা ঢাকা খুপরির মধ্যে তো দম বন্ধ হয়ে মরার কথা। তবে হ্যাঁ, রিলেটিভিটি বলে একটা কথা আছে। আইনস্টাইনের থিওরি। একটা গনগনে উনোনের ধার থেকে একজন হয়তো পালিয়ে বাঁচতে চায়। প্রেমিক তরুণ-তরুণী প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে, পাশে গনগনে উনোনের কথাই ভুলে যায়।

কিন্তু যে-মেয়ে এমন দামী অলঙ্কার পরে, সে কি রাস্তা-ঘাটে প্রেম করতে বেরোবে? মনে হয় না। আর এক হতে পারে, কোন মেয়ে বা বউ, রাগারাগি করে, বা শোকে আত্মহারা হয়ে এখান দিয়ে যাবার সময়, কোন রকমে খুলে পড়েছে।

চাঁদ বাড়ি ঢোকবার আগে, মোটামুটি ঠিক করে নিল, এখনই ব্যাপারটা জানানো ঠিক হবে না। আগে স্যাকরার কাছে গিয়ে যাচাই করে নিতে হবে, জিনিসটা খাঁটি কী না। মাঝখানের পাথরটা কী ধরনের রত্ন হতে পারে। তারপরে কান সজাগ রেখে, চলাফেরা করতে হবে। কোথাও কানপাশা হারাবার কথা কেউ বলে কী না। না শোনা গেলে, বা জানা গেলে, তখন ভেবে দেখা যাবে, কিংকর্তব্য।

বাড়ি ঢোকবার মুখে, বাগানের স্প্রিং-এর গেট ঠেলা দিতেই, বউদির গলা শোনা গেল। দাদা নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ বাড়ি ফিরেছে। তার

চাকরিস্থল এই শহরেরই মিউনিসিপালিটি। দাদা ওভারশিয়ার। বাবা এই বাড়িটি করে গিয়েছেন। অন্যথায় ওর আর দাদার আয়ে, এখন আর এ বাড়ি করা সম্ভব হত না। বাবা তাঁর সব কাজ নিজেই করে গিয়েছেন। দুই দিদি আর এক বোনের বিয়ে দিয়েছেন। কারোর জন্য কোন, তাঁর নিজের দায়িত্ব চাপিয়ে রেখে যাননি।

চাঁদ ঢাকা বারান্দায় উঠেই শুনতে পেল, বউদি তীক্ষ্ণ স্বরে বলছে, 'তুমি আমাকে চা চেনাবে? তোমার কাছে আমার চায়ের ভাল-মন্দ শিখতে হবে? কী বলতে চাও? তুমি আমাকে একশো টাকা কে-জি'র চা এনে দিয়েছ, আর আমি তোমাকে সজনে পাতার গুঁড়ো দিয়ে চা করে দিয়েছি?'

দাদার চড়া স্বর, 'সে কথা আমি মোটেই বলিনি। আমি তোমার মত কথা তৈরি করে বলি না। আমি বলেছি—'

'তার মানে?' বউদি মাঝপথেই ঝংকার দিয়ে উঠল, 'কথা তৈরি করা কাকে বলে? তুমি বলতে চাও, আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমি মিথ্যুক?'

দাদার স্বর, 'আরে কচুপোড়া খেল যা! কিসের থেকে কী? আমি আবার তোমাকে মিথ্যুক বললাম কখন? কিন্তু তুমি এই যে সব কথা বলছ, একশো টাকা কে-জি'র চা, সজনে পাতার গুঁড়ো, এসব কথা—'

'কচুপোড়া আমি কেন খাব? কচুপোড়া খাবে তুমি।' বউদি আবার বাধা দিয়ে ঝংকার দিল।

চাঁদ সামনের ঘরে ঢুকে দেখল, দাদা খালি গায়ে ধুতি পরে, বাবার আমলের বড় আরাম-কেদারায়, কোনরকমে পশ্চাদ্দেশ ঠেকিয়ে, খাড়া শক্ত হয়ে বসে আছে। বউদি রান্নাঘর আর ভাঁড়ারের মাঝামাঝি জায়গায়, চোখ-মুখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদকে ঢুকতে দেখে, বউদির কথায় এক মুহূর্তের জন্য বাধা পড়ল, দুজনেই একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপরেই বউদি আবার শুরু করল, 'আমাকে বলে

কচুপোড়া খেতে! নিজে কচুপোড়া চা কিনে নিয়ে এখন আমাকে তড়পানো হচ্ছে, অখাদ্য চা দিয়েছি। চা আমি নিজে কিনে এনেছি, না চায়ের বাগান করেছি?'

চাঁদ কথার ফাঁকে দেখল, দাদার বাঁ দিকে টেবিলের ওপর চায়ের গেলাস, চা ভর্তি। দাদা কাপে করে চা খাওয়া পছন্দ করে না। চাঁদ অনুমান করতে পারল, ঘটনা কী ঘটেছে। দাদা অফিস থেকে আসার পর, চা নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। তার অর্থ, অনেকক্ষণ ধরে চলেছে। গেলাসের চা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা জল। কিন্তু চাঁদের এখানে কোন ভূমিকা নেই। কারোর পক্ষাবলম্বন মানেই আর একজনের চক্ষুশূল হওয়া। কিন্তু ওরও চা পাওয়া দরকার এখন।

দাদা তখন শুরু করেছে, 'না, তুমি কিছুই করোনি, একটি কাজই করেছ, তা হল অখাদ্য চা করেছ, বুঝেছ? ভাল চা-পাতার মুণ্ডুপাত করেছ।'

'আমি ভাল চা-পাতার মুণ্ডুপাত করেছি?' বউদির স্বর এবার সপ্তমে উঠল, 'আমার বাপ-মা আমাকে চা তোয়ের করতেও শেখায়-নি?'

চাঁদ জানে বউদি এর পরে কী বলবে। ও বাঁ দিকে নিজের ঘরে ঢুকল। প্রথমেই গিয়ে দাঁড়াল ট্রানজিসটরের সামনে। এখন খেলার খবর রিলে করে শোনাচ্ছে। ও কাঁটাটা ঠিক জায়গায় এনে, বোতাম ঘুরিয়ে, প্রচণ্ড শব্দ তুলে দিল। মনে হল ঘরের মধ্যে বোমা ফাটছে। তারপরে ও খাটের ওপর বসে জুতোর ফিতে খুলতে আরম্ভ করল।

তিরিশ সেকেণ্ডও গেল না, দাদা দরজায় এসে চিৎকার করে বলল, 'কী হচ্ছে এটা?'

চাঁদ খুব মনযোগী গম্ভীর মুখে, হাত তুলে দাদাকে চুপ করতে বলল, এবং ওর গলার স্বর শোনা গেল না। দাদার গলাও যেন ট্রানজিসটরের শব্দ ছাপিয়ে উঠতে পারছে না, তবু সে ঘরের মধ্যে এক

পা বাড়িয়ে, তারস্বরে চিৎকার করে বলল, 'এটা কি বাড়ি না খেলার মাঠ, অ্যাঁ? কী ভেবেছিস তুই?'

দাদার কথা শেষ হবার আগেই, বউদিও দরজায় দেখা দিল, চিৎকার করে বলল, 'এ সবের মানে কী? তুমি কি আমাদের বাড়ির মধ্যে তিষ্টুতে দেবে না? এসেই একেবারে এত জোরে রেডিও খুলে দিলে?'

'তুই কি আমাদের শান্তিতে একটু কথাও বলতে দিবি না?' দাদা হেঁকে বলল।

শান্তিতেই কথা হচ্ছিল বটে। চাঁদ মনে মনে বলল, আর টেনে টেনে পায়ের মোজা খুলল। বউদি বলল, 'আমাদের শান্তি দেখবে ঠাকুরপো? বড় ভাই কথা বলছে, আর ও অমনি ভাবে রেডিও বাজায়?'

ট্রানজিসটরের একটি কথাও অবিশ্যি বোঝা যাচ্ছে না, কেবল গাঁক গাঁক জড়ানো চিৎকার ছাড়া। এদিকে দাদা-বউদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছে, নিজেদের ঝগড়ার কথা আর মনে নেই। দুজনেই এখন চাঁদের বিরুদ্ধে এক ফ্রণ্টে সামিল। চাঁদ তা-ই চেয়েছিল।

দাদা আবার চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে বলল, 'তুই কি এটাকে ভদ্দরলোকের বাড়ি মনে করিস না, অ্যাঁ? গোটা পাড়া জানিয়ে রেডিও শোনা হচ্ছে?'

বউদি বলল, 'ওগো, শুনছ, এ সব আমাদের দুজনের পেছনে লাগার মতলব। তুমি আমি যেন কথা না বলতে পারি, তার জন্য।'

'এত বড় সাহস তোর, স্বামী-স্ত্রীকে কথা বলতে দিবি না?' দাদা হুমকে উঠল।

চাঁদ বুঝল, কার্যসিদ্ধি। হাত বাড়িয়ে ট্রানজিসটর একেবারে নিস্তব্ধ করে দিয়ে বলল, 'খেলার খবরটা তোমাদের জন্য শোনা হল না।'

দাদা ফুঁসে উঠে বলল, 'এটাকে খবর শোনা বলে, রাসকেল, ইডিয়েট!'

চাঁদ জামা আর গেঞ্জি খুলে ফেলে, ওপর দিপেছন ফিরে ঘর 'খেলার খবরটা শুনব বলে, ফ্যানটা খুলতেই ভুলে গে।৮ গিয়ে, ফ্যানের সুইচ অন্ করে দিল। হয়ে

বউদি দাদার পাশে সরে এসে বলল, 'দেখছ তো, তুমি যে বকছ, তা যেন ছেলের কানেই যাচ্ছে না।'

'যাচ্ছে না আবার?' চাঁদ বলল, এবং হাতজোড় করে বলল, 'তোমরা বকছ বলেই তো রেডিও বন্ধ করে দিলাম। তোমাদের কারোকে আমি কখনো অমান্যি করেছি?'

দাদা সন্ধিগ্ধ চোখে তাকাল বউদির দিকে। বউদি দাদার দিকে। চাঁদ সেই ফাঁকেই, খুব মিহি করে বলল, 'বউদি, একটু চা খাওয়াবে? শরীরটা যেন আর বইছে না।'

'আমি খাওয়াব চা?' বউদির মুহূর্তে ভাবান্তর। চোখ বড় করে ঠোঁট উল্টে, দাদার দিকে একবার আড়চোখে দেখে বলল, 'আমি কি ভাই চা তৈরি করতে শিখেছি? তোমাদের দামী চা আমি নষ্ট করে দিই, ক্ষতি করি।'

দাদারও ভুরু কুঁচকে উঠল, বউদির দিকে তাকাল। চাঁদ মনে মনে বলল, 'এই রে, আবার ক্ষ্যাপা-ক্ষেপী দুটো ঝগড়া লাগাবার ফিকির করছে।' ও তাড়াতাড়ি হেসে বলল, 'তাই আবার কখনো হয় নাকি? এত বছর তোমার হাতে চা খেয়ে এলাম, কই কোনদিন তো মনে হয়নি, তুমি চা তৈরি করতে পার না?'

বউদির চোখে-মুখে প্রসন্নতার ঝলক লাগল, ওর দাদার দিকে আবার আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, 'সে ভাই ঠাকুরপো তোমার মনে হতে পারে, সবাইয়ের তো না হতেও পারে।'

'তার মানে?' দাদা মুখ শক্ত করে জিজ্ঞেস করল।

চাঁদ জোড়হাত করে বলল, 'দোহাই দাদা, তুমি আর বউদিকে বকা-ঝকা করো না। আমি চায়ের তেষ্টায় মরে যাচ্ছি।'

বউদি তৎক্ষণাৎ বরাভয়ের হাত তুলে বলল, 'ষাট বালাই, চায়ের

পা বাড়িয়ে. তাল কেন? আমি তোমাকে এখুনি চা করে দিচ্ছি মাঠ, অ্যাঁ?

নতুদির মুখে হাসি ফুটল, চোখের তারা ঘুরিয়ে, আধ-খসা ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে আবার বলল, 'বউদির হাতের চা তোমার ভাল লাগলে, বউদি কেন তা করবে না?' বলে দাদার পাশ থেকে সামনের ঘরের দিকে চলে গেল।

চাঁদ স্বর চড়িয়ে বলে উঠল, 'আমি সোনা মুখ করে খাব। দাদাও খাবে, বুঝলে বউদি। সোনা মুখ করেই খাবে।'

দাদা থাপ্পড় তুলে দু পা এগিয়ে এসে বলল, 'আমি বলেছি তোকে সোনা মুখ করে খাব?'

চাঁদ ছিটকে খাটের অন্য পাশে সরে গিয়ে বলল, 'কেন মিছিমিছি ঝগড়া করছ দাদা। সেই তো বউদির হাতেই আমাদের খেতে হবে।'

দাদা বলল, 'অমন সুন্দর দার্জিলিং ফ্লেবারের চা এনেছি। পাতাগুলো ভাল করে না ভিজিয়েই, অখাদ্য তৈরি করেছে।'

'সেটা তুমি বউদিকে আগে থেকেই বলে দিলে পারতে, পাতা যেন বেশিক্ষণ ভেজানো হয়।' চাঁদ বলল, 'মাঝখান থেকে চা না খেয়ে, তোমার মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেছে।'

দাদা বলল, 'গেছেই তো! ও আমার মুখে মুখে তর্ক না করলেই পারত! মুখ যে বন্ধ করতে জানে না।'

দাদাই যেন পারে! কিন্তু সে-কথা বলবার উপায় নেই। অথচ দুজনের ভাবের সময় বোঝাই যায় না, ওরা এত ঝগড়া করতে পারে। তখন দুজনে একেবারে কৈলাসে আসীন হর-পার্বতী। চাঁদের ভাষায়, 'তখন এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায় ছাখ।' ও হেসে বলল, 'আসলে বউদি তো ছেলেমানুষ।'

'বউদি ছেলেমানুষ!' দাদা আবার হুমকে উঠল, 'ডেঁপোমি হচ্ছে?'

চাঁদ তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার কথা বলছি না, তোমার কাছে তো বউদি ছেলেমানুষই। তাই একটু ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে—।'

'থাক, আর পাকামি করতে হবে না।' দাদা পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চাঁদের এইটি কপাল। দাদার কাছে ও কখনো সাবালক হয়ে উঠতে পারল না। ও আলনা থেকে লুঙ্গি নিয়ে, প্যান্ট ছেড়ে জড়িয়ে নিল। গরমে জ্বলে যাওয়া শরীরটা এতক্ষণে একটু ঠাণ্ডা হল। প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে, বাবার আমলের ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল। সাবেক কালের সবই অন্যরকম ছিল। মস্তবড় একটা টেবিলের ওপরে, ডিম্বাকৃতি আয়না। ড্রয়ারগুলো ঢাউস। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, চিরুনি দিয়ে উসখো-খুসকো চুল আচড়ে নিল। নিজের চেহারাটা একবার দেখল।

চাঁদের চেহারাটা খারাপ না। মোটামুটি লম্বা, গায়ে মেদ নেই। এখনো ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, কিছুক্ষণের জন্য ডন-বৈঠকের অভ্যাসটা বজায় রেখেছে। শরীরের গঠনটা ভাল। চোখ-মুখও খারাপ না। কিন্তু সবাই ওকে 'মাঝে টেরি' বলে ঠাট্টা করে। কারণ ও চুলের মাঝখানে সিঁথি কাটে। মাঝখানে সিঁথি কাটার অপরাধ কী, ও ভেবে পায় না। যেন ওর সব ভাল, সিঁথিতেই খতম। চুল উলটে আঁচড়ালে বা এক পাশে সিঁথি কাটলেই কি ওকে কার্তিক ঠাকুরের মত দেখাত? সকলে যা করবে, ওকে তাই করতে হবে কেন? পৃথিবীতে অনেক নাম-করা ব্যক্তিরাই মাঝখানে সিঁথি কাটতেন, এখনো কাটেন। তা ছাড়া, চাঁদ জানে ওটাই ওর বৈশিষ্ট্য। আজকাল অনেকে কপাল ঢেকে চুল আঁচড়ায়। কেন আঁচড়ায়, তাও চাঁদ জানে। কপাল তাদের মাঠের মত বিরাট, সামনে থেকে চুল উঠতে আরম্ভ করেছে। কপাল না ঢেকে উপায়ই বা কী?

চাঁদ খোলা জানলা দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকাল। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। ওদের ছোটখাটো বাগানটার ওপারেই, ফেলু পালের একতলা বাড়ি। ছাদের ওপর ফেলু পালের মেয়ে দুটো নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে, কী যেন বলাবলি করছে, আর পশ্চিম দিকে

তাকাচ্ছে। চাঁদ পশ্চিম দিকে লক্ষ্য করে দেখল, নরেন চক্রবর্তীর দোতলা ভাড়া-বাড়ির ছাদে, চশমা পরা এক যুবক উদাস হয়ে, আলসের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

চাঁদ বুঝল, ফেলু পালের মেয়েরা কেন হাসাহাসি করছে। এমনিতেই মেয়ে দুটো চোখে-মুখে কথা বলে। দুজনেই এখন কলেজে পড়ছে। পাড়ার সব ছেলেরাই ওদের ইয়ার। চাঁদকে দাদা বলে, কিন্তু ইয়ার্কি মারতে ছাড়ে না। মেয়ে দুটোকে চাঁদের এমনি খারাপ মনে হয় না। কারণ পাড়ার ছেলেরা ওদের মুখকে বেশ ভয়ও পায়। নরেন চক্রবর্তীর বাড়ির দোতলায় যে চশমা পরা ছেলেটা, চাঁদ তাকেও জানে। কলেজের লেকচারার বিজন চৌধুরীর ছোট ভাই। এখানে থাকে না, মাঝে মাঝে আসে। চুল দিয়ে কপাল ঢাকা, উদাস ভাব। এই গরমে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে আলসের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা ফেলু পালের ছাদের দিকেই, কিন্তু দৃষ্টিটা যেন অনেক দূরে।

ফেলু পালের মেয়েদের কাছেই চাঁদ শুনেছে, 'বিজনদা যখন আমাদের ক্লাসে পড়ায়, তখন আমরা সব ব্যাটাছেলে হয়ে যাই, উনি মেয়ে হয়ে যান।'

চাঁদ অবাক হয়ে ভেবেছিল, তার মানে কী? পরে বুঝতে পেরে খুব হেসেছিল। বিজন চৌধুরীর এমনি চালচলন কথাবার্তাই একটু মেয়েলি সহবত মার্কা। যাকে বলে ললিত লবঙ্গলতা পুরুষ, কথা বলে চিবিয়ে চিবিয়ে। মেয়েদের পড়াতে গিয়ে কেমন একটু দিশেহারা লজ্জা লজ্জা ভাব ফুটে ওঠে। সেইজন্য মেয়েরা তার নাম দিয়েছে, বিজনবালা। ভাইটির রকম-সকমও সেই রকম। অথচ বিজন চৌধুরীর স্ত্রী সম্পূর্ণ বিপরীত। ফর্সা মোটা, হাসিখুশি। পরিষ্কার কথাবার্তা। যাকে বলে ঢঙ, তার ধারে-কাছে নেই। বিজন চৌধুরী যে স্ত্রীকে ভয় পায়, এখন পাড়ার সবাইও সে-কথা জানে।

'এই যে দাদা, এদিকে ভাল করে দেখুন।' ফেলু পালের এক মেয়ে স্বর চড়িয়ে বলে উঠল, তারপরে দুজনেই খিল খিল করে হেসে উঠল।

একজন আর একজনের পিঠে একটা কিল মারল।

চাঁদেরও হাসি পেয়ে গেল, মনে মনে বলল—মেয়েগুলো পাজী আছে।

বউদি ঢুকল ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে। বলল, 'কি গো, সুন্দরীদের দেখছ নাকি?'

চাঁদ ফিরে বলল, 'না, সুন্দরীদের কাণ্ড দেখছি। বিজনবাবুর ভাইয়ের পেছনে কেমন লেগেছে।' বলে বউদির হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে বলল, 'বাহ্, চায়ের কী সুন্দর গন্ধ ছেড়েছে! বিউটিফুল! দাদাকে দিয়েছ তো?'

বউদি ঘাড় ঝাঁকিয়ে, ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'আমার বয়ে গেছে।'

কিন্তু বউদির চোখের হাসিতে অন্য কথা। একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চাঁদ ওর ঘরের দরজার পাশ থেকে দেখল, দাদা সেই আরাম-কেদারাটিতে চুপচাপ বসে আছে। বাঁদিকের টেবিলে সেই গেলাসটি নেই। বউদিকে আবির্ভূত হতে দেখা গেল। হাতে ধূমায়িত আর একটি চায়ের গেলাস। দাদার কাছে এসে, ঠক করে টেবিলের ওপর গেলাস রেখেই আবার ভিতর দিকে চলে গেল।

চাঁদ দাদার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। মিনিট খানেক চুপচাপ বসে থাকার পরে, দাদা একবার বউদির চলে যাওয়া দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল। তারপরে গেলাস হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিল। বার দুই চুমুক দিয়ে, গলা-খাঁকারিতেই বোঝা গেল, মেজাজ প্রসন্ন। আরো কয়েকবার চুমুক দিয়ে, দাদা ভিতর দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকল. 'পরী. ও পরী!'

দাদার স্বর এখন কী কোমল! কিন্তু তার পরীর কোন সাড়া নেই। চাঁদ হেসে নিজের কাপে চুমুক দিল।

দাদা আবার ডাকল, 'পরী শুনছ?'

দরজায় পরীর আবির্ভাব হল। বউদির পরী নামটা অসার্থক না। তবে ফরসা রঙের সঙ্গে, চোখ-মুখ এমন কাটা কাটা, একটি তীক্ষ্ণ ভাব,

দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে মানায় বেশি। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'কী, শুনবটা কী?'

দাদা বলল, 'এবার কিন্তু চা-টা সত্যি ভাল হয়েছে।'

'তাই আর ঝগড়া করা গেল না, না?' বউদি রোখাভাবেই বলল, 'তবু যা হোক তোমার ভাল লেগেছে। সেটাই আমার সাতপুরুষের ভাগ্যি।'

বলেই বউদি ভিতরে চলে গেল।

দাদা তাড়াতাড়ি উঠে বলল, 'চলে গেলে নাকি? শোন, তখন বাজার থেকে কী আনবার কথা যেন বলছিলে?' বলতে বলতে চায়ের গেলাস নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

চাঁদ নিজের মনেই বলে উঠল, 'বোঝ এখন। কেন যে এরা ঝগড়া করে!'

ও চায়ের কাপ টেবিলে রেখে, সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে তুলতেই, হঠাৎ কানপাশাটার কথা মনে পড়ে গেল। চমকিয়ে উঠে, তাড়াতাড়ি ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রাখা শার্টের বুকপকেটে হাত ঢোকাল। কানপাশাটা হাতে উঠে এল। ঘরের দরজা ছিটকিনি বন্ধ করে, সিগারেট ধরিয়ে এবার ভাল করে দেখল। মোটেই সস্তা কিছু মনে হল না। ওজনও কম না। কানের পক্ষে একটু ভারিই। তা হোক। অলঙ্কার তো! কষ্ট করেও মেয়েরা সাধারণত পরতে ভালবাসে। বউদিকে ডেকে দেখালে, এখনই বলে দিতে পারত জিনিসটা খাঁটি কী না, পাথরগুলোই বা কী। কিন্তু চাঁদের ধারণা, এখন প্রকাশ না করাই ভাল। জানাজানি করলেই, দাবী-দারেরা এসে ভিড় জমাবে। তখন ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড়। আগে আসল নকলটা অন্য জায়গা থেকে জানতে হবে।

চাঁদ ঘরের আশেপাশে তাকাল। ওর তেমন গোপনীয় জায়গা কিছু নেই, ড্রেসিং টেবিলের ঢাউস দেরাজ ছাড়া। চাবি দিয়ে স্যুটকেসে রাখার কোন অর্থ হয় না। ও ভেবে চিন্তা করে, সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যেই কানপাশাটা ঢুকিয়ে, বন্ধ করল। প্যাকেটটা যেমন থাকে, তেমনি রেখে দিল টেবিলের ওপর। তারপরে গেল স্নান করতে।

ানের পরে, জলখাবার খেয়ে, পায়জামা-পাঞ্জাবি চাপিয়ে চাঁদ আগে গল, বিশেষ চেনাশোনা স্বর্ণকারের দোকানে। গিয়ে একটা সরাসরি মিথ্যা কথা বলল, 'ছাখ তো গোপালদা, এ কানপাশা নাকি তোমার এখানে তৈরি ?'

চশমা চোখে মধ্যবয়সী গোপালদা কানপাশাটা হাতে নিয়ে, আলোর ামনে ধরল। কয়েক মুহূর্ত দেখেই বলল, 'কে বলেছে আমার এখানে তরি ? এ তল্লাটে কেউ এরকম সোনার গায়ে জালির কাজ করতে পারে না।'

চাঁদ বলল, 'কিন্তু বললে যে, তোমার এখানে বানিয়েছে ?'

'মিথ্যে কথা।' গোপালদা বলল, 'নিশ্চয় আমাকে কেউ ডোবাবার তালে এ কথা বলেছে।'

'ডোবাবে কেন ?'

'হয়ত চোরাই মাল, আমার নাম জড়াবার তাল করছে।'

চাঁদ জিভ কেটে বলল, 'ছি, ছি, ছি, চোরাই মাল বলছ কী গোপাল া! হতে পারে এখন তাদের অবস্থা খারাপ, কিন্তু বিরাট বনেদী বাড়ির জিনিস।'

গোপালদা আবার কানপাশাটা দেখে বলল, 'বনেদী বাড়ির জিনিস, াতে ভাই কোন সন্দেহ নেই। এ তো খাঁটি হীরে বসানো কানপাশা। ারপাশে খাঁটি মুক্তো দিয়ে ঘেরা। আর এই জালির কাজ কি সামান্য ? খলে চোখ ফেরানো যায় না, এমন কারিগরি! কিন্তু আমার নামটা ন জড়িয়েছে, তা তো বুঝতে পারলাম না ?'

চাঁদ নিরীহ মুখ করে বলল, 'তাই তো। তবে আমাকে যে ভদ্র-

মহিলা বলেছে, সে হয়তো জানে না, তাই তোমার নাম করেছে। আমাকে বললে, ইচ্ছে হলে, গোপালবাবুর কাছে যাচাই করে নিয়ে আসতে পার।'

গোপালদা ভুরু কুঁচকে বলল, 'যাচাই করতে বলেছে। আমরা বানিয়েছি বলেছে কী ?'

চাঁদ বলল, 'আমি ভাবলাম, তোমার কাছে যখন যাচাই করতে বলেছে, তাহলে তুমিই বানিয়েছ।'

গোপালদা হেসে উঠে বলল, 'তোমরা আজকালকার ছেলে-ছোকরারা যে লেখাপড়া শিখে, কী আজেবাজে কথা বল, তার ঠিক নেই। এবার বুঝেছি। তা কী হয়েছে, এটা যাচাইয়ের দরকার হল কেন ?'

চাঁদ বলল. 'এটা বন্ধক রেখে পাঁচশো টাকা ধার চায়।'

গোপাল বলল, 'হেসে খেলে দিতে পার। হীরেটার দামই তে হাজার টাকার বেশি। জোড়ার আর একটা কোথায় ?'

চাঁদ বলল, 'তা জিজ্ঞেস করিনি। একটাই বন্ধক রাখতে দিয়েছে।'

গোপালদা আর একবার কানপাশাটা দেখে বলল, 'চোখ বুজে পাঁচশো টাকা দিতে পার। আমার মতে, হীরেটার দাম কম করে দেড় হাজার টাকা। সোনাও কম করে আধ ভরি আছে। মুক্তোগুলোর দামও কিছু কম না। আমাদের এ শহরে এমন জিনিস আমি আর দেখিনি।'

চাঁদের কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল। আসলে স্বর্ণকারদের ও প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারে না। মিথ্যে কথার অবতারণাটা সেই জন্যই করতে হল। গোপালদা এক টুকরো বেগুনি কাগজে কানপাশাটা মুড়ে, চাঁদের হাতে দিয়ে বলল, 'সাবধানে নিয়ে যেও। এসব জিনিস নিয়ে বেশি ঘোরাফেরা করো না। যাদেরই জিনিস হোক, তারা খুব শৌখীন লোক টাকাওয়ালাও বটে। যার তার ঘরে এ জিনিস থাকে না। মনে হচ্ছে কলকাতার কোন নাম-করা স্যাকরার হাতে বানানো। তুমি আমার নাম করে খুব ঘাবড়ে দিয়েছিলে।'

চাঁদ কানপাশাটা হাতে নিয়ে বলল, 'আসলে আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। তাহলে বলছ, পাঁচশো টাকা দেওয়া যায়?'

'পাঁচশো কী বলছ? তুমি আমার কাছে রাখো না, হাজার টাকা দেব।' গোপালদা বলল।

চাঁদ মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, ডাইনির হাতে ছেলে সমর্পণ।' ও উঠে বলল, 'টাকাটা আবার তাদের শোধ করতে হবে তো, পাঁচশোর বেশি দরকার নেই। তাছাড়া, আমি তো আর এসব কারবার করি না, সুদও নেব না। পাড়াপ্রতিবেশীর ব্যাপার, বুঝলে তো?'

'বিনা সুদে পাঁচশো টাকা ধার দেবে?' গোপালদা অবাক চোখে, চশমার কাঁচে ঝিলিক দিয়ে তাকাল।

চাঁদ বলল, 'নিজেদের মধ্যেই ব্যাপার, অভাবে পড়েছে।'

গোপালদা একটা উদ্‌গত নিশ্বাস চেপে বলল, 'তা অবিশ্যি ঠিক।'

'চলি গোপালদা।' চাঁদ স্বর্ণকারের দোকান থেকে বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে চলল ক্লাবের দিকে। ভাবল, কানপাশাটার বিষয়ে ও কিছু ভুল ভাবেনি। খাঁটি জিনিস দেখলেই কেমন চোখে লাগে। কিন্তু ওর ভাবনা গেল বেড়ে। কাদের, কোন্ বাড়ির, কোন্ মেয়ের জিনিস হতে পারে? গোপাল কর্মকারের বক্তব্য, এরকম জিনিস সে এ অঞ্চলে কখনো দেখেনি। গোপালদার এ শহরে যথেষ্ট নাম-ডাক। বড় বড় বাড়ির কাজকর্ম তার কাছে হয়। সে যখন বলছে, এখানকার স্বর্ণকারদের কাজ এটা নয়, তবে কোথাকার? সত্যি কলকাতার নাকি? কলকাতার লোক, এখানে এসে কানপাশা হারিয়ে গেল? তাও আবার মিত্তিরদের পোড়ো বাগানের পথে!

চাঁদ চিন্তিত হয়ে উঠল। অথচ ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। এরকম একটা দামী জিনিস নিজের কাছে রাখতেও স্বস্তি বোধ করছে না। পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে, মুঠো করে চেপে ধরে রাখতে হচ্ছে। কিন্তু ওর মনে বিন্দুমাত্র লোভ নেই, অলঙ্কারটি নিজের সম্পত্তি করবার। ঠিক এই কারণেই দাদা-বউদিকে বলতেও সংকোচ হচ্ছে। তারা আবার

কী ভেবে বসবে, কে জানে।

এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে, চাঁদ ক্লাবে এল। বকুলতলায় ইতিমধ্যে বাতি ঝুলিয়ে তাসের পার্টি বসে গিয়েছে। কিন্তু এখন ও তাস খেলার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করছে না। মন পড়ে আছে হীরার কানপাশার প্রতি। ওর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে যতীন একজন। তাস খেলার নিয়মিত পার্টনার। বন্ধু অনেকেই, কিন্তু তার মধ্যে কয়েকজন বিশেষ অন্তরঙ্গ। যতীন, শম্ভু, দিলীপ ওরফে খোকন, আর নিমাই। এদের মধ্যে যতীন আর খোকন সম্প্রতি বিয়ে করেছে। আর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজনের বিয়ে হলেই, অন্যান্যদের মনেও কেমন একটা তরঙ্গের ঢেউ লাগে। সেরকম ঢেউ চাঁদের মনেও লেগেছে। কিন্তু কথাটা ও এখনো কারোকে মুখ ফুটে বলেনি। আসলে ও এখনো পর্যন্ত মনস্থির করে উঠতে পারেনি। যদিও বউদি তার তুই বোনের জন্য ওর আর দাদার পিছনে লেগে রয়েছে।

চাঁদ দেখল, যতীন ইতিমধ্যেই শম্ভুকে পার্টনার করে খেলতে বসে গিয়েছে। ওকে দেখেই বলল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি? আমি শম্ভুকে নিয়ে বসে গেলাম?'

চাঁদ বলল, 'ভালই করেছিস, আমার আজ খেলায় মন নেই।'

'মনটাকে আবার কোথায় রেখে এলি?' শম্ভু তাসের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল।

অলক এক পলক চাঁদকে দেখে নিয়ে বলল, 'বোধহয় কোন মিষ্টি হাতের মুঠোয়। কোন মেয়ের হাত দেখে এলো বোধহয়।'

চাঁদ জানে, অলক ওদের পাড়ার মধুমিতা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। বলল, 'হ্যাঁ দেখে এলাম, মধুমিতার হাত।'

যতীন হেসে উঠে বলল, 'মধুমিতার হাত কী বলে রে চাঁদ?'

'বিয়ের এক মাস পরে পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ প্রেম।' চাঁদ বলল

অলক ছাড়া সবাই হেসে উঠল। পাশে যারা তাস খেলছিল তারাও। অলক গম্ভীর হয়ে বলল, 'সকলের মাঝখানে, এভাবে

একজনের নামটা বলার কী দরকার? এসব কথা তার বাবা-মার কানে গেলে, ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? যা বলবি, তা আমাকে নিয়ে বল্।'

'হ্যাঁ, এরকম হাটে হাঁড়ি ভাঙা ঠিক নয়।' তপন বলল, 'কোড নেম ইউজ্ করতে পারিস না? নামটা হানি ফ্রেণ্ড বললেই হয়।'

অলক খেঁকিয়ে উঠল, 'তপন ভাল হচ্ছে না, ঝাড় খাবি।'

তপন হেসে বলল, 'আমি খারাপ কথা বলেছি? আর চাঁদ যে অবৈধ প্রেমের কথাটা বলল, তার জবাবটা তুই দিতে পারলি না? অবৈধ প্রেমিকটি তো আসলে চাঁদ।'

আবার সবাই হেসে উঠল। চাঁদ বলল, 'হানি ফ্রেণ্ড বড্ড লম্বা, আমি ওর প্রেমিক হতে পারব না।'

শম্ভু বলল, 'চাঁদ, তুই যতীনের সঙ্গে বোস্, আমি দাবা খেলব।'

চাঁদ বলল, 'আমি আজ খেলবো না।'

যতীন চাঁদের দিকে তাকাল। চাঁদ বলল, 'একটা কথা ছিল। খোকন আর নিমাই কোথায়?'

যতীন বলল 'খোকনকে দেখিনি। নিমাই এসেছে, ও বোধহয় ঘেরা মাঠে বসেছে। তুই কি সত্যি সত্যি খেলবি না?'

'সত্যি সত্যি খেলব না।' চাঁদ বলল, 'তোকেও আজ খেলা ছেড়ে উঠতে হবে। তুই আর শম্ভু দুজনেই চল্ ঘেরা মাঠে যাই। নিমাই আছে কী না দেখি। একটা জরুরী কথা আছে।'

যতীন অবাক জিজ্ঞাসু চোখে একবার চাঁদকে, আর একবার শম্ভুকে দেখল। শম্ভুও দেখল, তারপরে বলল, 'অলক, তোরা তা হলে অন্য কারোকে নিয়ে খেল্, আমরা উঠি।'

অলক রুষ্ট হয়ে বলল, 'অমনি একেবারে পীরিত চেগে উঠল। এ ভাবে খেলা হয়?'

যতীন বলল, 'শুনছিস তো, চাঁদ কী জরুরী কথা বলবে।'

শম্ভু দ্বিধা করে বলল, 'চাঁদ, কোন খারাপ খবর আছে নাকি?'

চাঁদ গম্ভীর হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তা একটু খারাপ। বিশেষ একটা গোলমাল ঘটে গেছে, তোদের বলা দরকার।'

যতীন উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে শম্ভুও। যতীন বলল, 'চল্, আমি আবার এরকম কথা শুনলে, চুপচাপ থাকতে পারি না।'

ওরা চলে যাবার সময়, অলক পিছন থেকে বলে উঠল, 'এই শালা মাঝে টেরি যত গোলমালের মূলে।'

চাঁদ রুখে উঠে ফিরতে যাচ্ছিল। যতীন ওর হাত টেনে ধরে বলল, 'ও ফয়সালা পরে হবে। আগে চল্, তোর কথা শুনি।'

ওরা তিনজনেই ঘেরা মাঠে এল। মাঠের একদিকে পুকুর, সেদিকে পাঁচিল নেই। বাকি তিনদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মাঠে ঢোকবার জন্য একটা দরজা আছে। রাস্তার ক্ষীণ আলো মাঠে এসে পড়েছে, স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। গরমের সময় পুকুরের ধার ঘেঁষে একটু ঠাণ্ডা লাগে। বাতাস থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু আজ গাছের একটি পাতা নড়ছে না। গুমোট গরমে কাঁটাল পাকছে।

মাঠের আশে-পাশে, দু-তিনজনের ছোট ছোট গুচ্ছ ছড়িয়েছিল। শম্ভু ডাকল, 'নিমাই কোথায় রে?'

নিমাই সাড়া দিল, 'এদিকে। কে, শম্ভু?'

শম্ভু ডাকল, 'হ্যাঁ, তুই একবার এদিকে আয়।'

নিমাই দু-তিনজনের সঙ্গে বসেছিল। উঠে কাছে এল। ওরা চারজনে একটা নিরিবিলি কোণ নিয়ে বসলো। চাঁদ মোটামুটি কানপাশা সংবাদ সবই বলল।

শম্ভু বলে উঠল, 'এর আর বলাবলির কী আছে? মাল ঝেড়ে দে।'

নিমাই বলল, 'তারপরে একটা গ্র্যাণ্ড ফিস্টি লাগানো যাক।'

চাঁদ আর যতীন হঠাৎ কিছু বলল না। শম্ভু আবার বলল, 'গোপাল কর্মকারকেই ভজিয়ে-ভাজিয়ে, হাজার দেড়েক টাকা বের করে নেওয়া যাক। পাঁচশো টাকা ফুর্তি করে খাওয়া যাক, হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে দে।'

'আমার বাবার টাকা নাকি, যে ফিক্সড্ ডিপোজিট করব।' চাঁদ রুষ্টস্বরে বলল।

নিমাই বলল, 'বাপের কথা আসছে কেন? এ তো পড়ে পাওয়া ষোল আনা। ধরে নে, একটা ছোটখাটো লটারি তোর কপালে লেগে গেছে।'

এই সময়ে খোকনও ওদের খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়ল। পাঁচ মাথা এক হল। খোকনকে জানাবার জন্য, ঘটনাটা আর একবার বলতে হল। খোকন প্রথমেই বলল, 'কার যে কপাল পুড়েছে, কে জানে?'

শম্ভু বলল, 'কপাল যারই পুড়ুক, আমাদের ভেবে কী লাভ?'

'হ্যাঁ, কারোর পৌষ মাস, কারোর সর্বনাশ।' যতীন বলল, 'চাঁদ, তুই বল্ তো, তোর ইচ্ছাটা কী?'

চাঁদ বলল, 'আমার ইচ্ছার কথা যদি বলিস, আমি চাই, যার জিনিস, সে ফেরত পেয়ে যাক্।'

খোকন বলল, 'কী করে সেটা হবে?'

নিমাই বলল, 'ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানালে, একটা কিচাইন্ হয়ে যাবে।'

যতীন বলল, 'কিচাইন্ কেন হবে? হলেই হল?'

খোকন বলল, 'মালটি কারোর সামনে বের করা হবে না।'

চাঁদ বলল, 'তা বের করব না। আমার মতে, স্টেশনে, আর দু-তিন জায়গায় ছোট ছোট পোস্টার কয়েকটা সেঁটে দিলেই হবে।'

'কিন্তু তাতে লেখা চলবে না, হীরের কানপাশা পাওয়া গেছে।' যতীন বলল, 'লিখতে হবে, একটি সোনার কানপাশা পাওয়া গেছে।

যার কানপাশা, সে যেন উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করে, কানপাশাটা নিয়ে যায়।'

খোকন বলল, 'নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীচন্দ্রনাথ হালদার। ছ নম্বর তর্করত্ন রোড।'

'কিন্তু রবিবার সকালে ছাড়া হবে না।' চাঁদ বলল, 'রোজ রোজ কাজ থেকে ফিরে, সন্ধ্যেবেলা জ্বালাতন হতে পারব না।'

নিমাই বলল, 'কিন্তু যারাই আসুক, প্রমাণটা দাখিল করবে কী করে?'

যতীন বলল, 'প্রমাণ দাখিল করার একটি মাত্র উপায় আছে। কানপাশা তু কানের তুটো। একটা হারিয়েছে, বাকিটা নিশ্চয় তাদের কাছে আছে। সেটি দেখালেই হবে।'

খোকন বলল, 'হ্যাঁ, এই হল ঠিক বুদ্ধি। কিন্তু তু-একদিন অপেক্ষা করা দরকার। নিজেদের চেনাশোনার মধ্যে কিছু শোনা যায় কি না দেখা যাক। তবে আমরা কারোকে কিছু বলব না।'

শম্ভু হতাশ হয়ে বলল, 'আমি ভাবলাম, কোথায় একটু ভাল-মন্দ খাওয়া হবে। তোরা একেবারে সব যুধিষ্ঠির হয়ে গেলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কেউ উপযুক্ত প্রমাণ না দিতে পারে, তখন কী হবে? চিরকাল তো আর প্রমাণের জন্য বসে থাকা যাবে না?'

খোকন বলল, 'তখন চাঁদের বিয়েতে, ওর বউকে কানপাশাটা ভাঙিয়ে একটা গহনা গড়িয়ে দেওয়া হবে।'

'তাহলে খ্যাটন হবে না?' নিমাই বলল।

যতীন বলল, 'চাঁদের বিয়েতেই তো খ্যাঁটন হবে।'

চাঁদ বলল, 'মাথা নেই তার মাথাব্যথা। আর তাই যদি হয়, আমি কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস আমার বউকে দেব কেন? তার ওপরে আবার হীরে! হীরে সকলের সয় না। আমার বউদিকে আমি হীরে পরতে বারণ করেছিলাম। তবু বউদি একটা হীরের নাকছাবি গড়িয়ে পরেছিল। সাতদিন যেতে না যেতে, খুলতে তর সয় না।'

খোকন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল ?'

'কী আবার।' চাঁদ বলল, 'দাদা-বউদিতে এমনিতেই রোজ ঝগড়া। নাকছাবি পরার পরে ঝগড়ার আর সময়-অসময় ছিল না। বউদির হাত পুড়ল, দাদা সাইকেল থেকে পড়ে মাথা ফাটাল। রোজ একটা না একটা ক্ষতি হচ্ছিল। শেষটায় বউদি বাথরুমে পড়ে গিয়ে, নাকে চোট লেগে, নাক থেকে গল গল করে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। সে-রক্ত আর বন্ধই হতে চায় না। আমি তখন জোর করে বউদির নাক থেকে হীরের নাকছাবিটা খোলালাম।'

'তারপরেই শান্তি ?' নিমাই বিদ্রূপ করে বলল।

চাঁদ বলল, 'ঠাট্টা করতে হবে না। আমার বউদির মত লোক, সহজ ব্যাপার না। গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখিস।'

যতীন বলল, 'এ কানপাশাটাও বোধ হয় সেই রকম কোন মেয়ের, যার হীরে সয় না, তাই কান থেকে খসে পড়ে গেছে।'

সবাই হেসে উঠল। খোকন বলল, 'হ্যাঁরে চাঁদ, নষ্ট কোষ্ঠী যেমন উদ্ধার করা যায়, কানপাশা দেখে মেয়েটার ভাগ্য জানা যায় না ?'

'শালা, আমার পেছনে লাগা হচ্ছে ?' চাঁদ ক্ষ্যাপা স্বরে বলল, 'কান পাশাটা নিয়ে তো আর মেয়েটা মায়ের পেট থেকে জন্মায়নি ? জন্মালে কানপাশা দেখেই বলা যেত।'

যতীন বলল, 'থাক এখন বাজে কথা, কাজের কথা হোক ! প্রথমে মনে রাখতে হবে, দু-তিনদিন কারোর মুখ থেকে যেন এ বিষয়ে একটি কথাও না বেরোয়। কানপাশাটা কখনো বাইরের কারোকে দেখানো হবে না। যখন জোড়ার ঠিক আর একটা কেউ দেখাবে, তখনই সেটা বের করা হবে। পোস্টার পড়লেই অনেকে অনেক কথা বলতে আরম্ভ করবে, ওসবে কান দিলে চলবে না। আর পোস্টারে লেখা চলবে না, কানপাশাটা কোথায় পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে, এই পর্যন্ত।'

সকলেই একমত হল। আজ বুধবার, শনিবার নিমাই সুন্দর করে কয়েকটা পোস্টার লিখবে, সকলে মিলে সন্ধ্যেবেলা সেগুলো যথাস্থানে

সেঁটে দিয়ে আসবে। নিমাইয়ের হাতের লেখা সুন্দর। স্থির হল, স্টেশনে সিঁড়ির সামনের দেওয়ালে আর বুকিং অফিসের সামনে পোস্টার লাগানো হবে। সব লোকেরই ওদিকে ভিড়। যতীন প্রস্তাব করল, 'রামবাবুর রেস্টুরেন্টের ঢোকবার মুখে একটা।'

নিমাই বলল, 'আমাদের পাড়ার চৌমাথায় একটা দেওয়া দরকার।'

'কলেজের গেটে একটা দিবি নাকি?' চাঁদ জিজ্ঞেস করল।

খোকন প্রতিবাদ করে বলল, 'কলেজের মেয়েরা ওসব কানে লাগিয়ে কলেজে আসে না।'

শম্ভু বলল, 'আমার মনে হয়, এ নিশ্চয়ই কোন নতুন বিয়ে হওয়া বউয়ের।'

'এই ভাদ্র মাসে নতুন বিয়ে?' নিমাই ঠাট্টা করে বলল।

শম্ভু বলল, 'গাড়োলের মত কথা বলিস না। গেল শ্রাবণে যাদের বিয়ে হয়েছে, সে বিয়ে কি পুরনো হয়ে গেছে?'

যতীন বলল, 'কথাটা কিন্তু ভেবে দেখবার মত। মিত্তিরদের বাগান দিয়ে চলাফেরা করতে পারে, এরকম কোন্ মেয়ে বা বউয়ের কানে এরকম কানপাশা থাকতে পারে? আঢ্যিদের বাড়ির হতে পারে কী? এ তল্লাটে আঢ্যিরাই সব থেকে বড়লোক।'

শম্ভু বলল, 'ওদের ঘরে নাকি অঢেল সোনা আছে।'

'কিন্তু ওদের বাড়ির মেয়েরা কতটুকু বাইরে বেরোয়?' নিমাই বলল, 'কলেজে ইস্কুলে যারা যায়, তারা নিশ্চয় ওরকম কানপাশা পরে বেরোয় না। বউরা কেউ মিত্তিরদের বাগানের রাস্তা দিয়ে কখনো যাবে না।'

চাঁদ বলল, 'গ্যাখ যতীন, আঢ্যিবাড়ি আর অমুক বাড়ি, এসব আন্দাজ করে ভেবে কোন লাভ নেই, তল পাওয়া যাবে না। আমরা পাঁচজনই ছ'দিন এদিক ওদিকে কান রাখব, কানপাশা হারাবার কথা কেউ কিছু বলে কী না। তারপর পোস্টার দেখে, যার হারিয়েছে, সে ঠিক আসবে। পোস্টার তো আমাদের দিতেই হচ্ছে, তাই না?'

যতীন স্বীকার করল, 'তা অবিশ্যি ঠিক। তবে ভাবনাটা যেতে চায় না।'

'ঠিক বলেছিস।' খোকন বলল, 'আমারও মাথায় ওই চিন্তা। মিত্তিরদের বাগানের রাস্তায় কোন্ মেয়ের কানপাশা পড়তে পারে?'

নিমাই বলল, 'পাড়ার বেপাড়ার সব মেয়েদের কথা ভাবতে থাক। ইনক্লুডিং তোর বউ।'

খোকনের বেশ লম্বা আর বলশালী শরীর। ও হাত তুলে নিমাইকে মারতে উদ্যত হল। নিমাই মাথা নিচু করে শুয়ে পড়ল।

'কিন্তু মালটা একবার আমাদের দেখাবি না?' যতীন বলল।

চাঁদ পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'অন্ধকারে দেখা যাবে?' বলতে বলতে, পকেট থেকে কাগজের মোড়ক বের করে খুলল।

অন্ধকারের মধ্যে সেটা চিকচিক করে উঠল, বিশেষ করে হীরাটা। সকলেই একবার হাতে স্পর্শ করে দেখল, এবং সকলেই বলল, খাঁটি মাল।

যতীন বলল, 'সাবধানে রাখিস।'

'শালা আমিও তো আজ মিত্তিরদের বাগান দিয়ে দুবার যাতায়াত করেছি,' শম্ভু বলে উঠল, 'আমার চোখে কেন পড়ল না?'

নিমাই বলল, 'পড়ল না, কারণ তুই বেমালুম ঝেড়ে দিতিস। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, তাই চাঁদের চোখে পড়েছে।'

শম্ভু বলল, 'খচ্চর!'

তারপর সবাই উঠে পড়ল। আজ আর তাসের আড্ডায় কেউ গেল না। রাত দশটা বাজতে চলেছে।

চাঁদের কাছে রবিবার সকালে ঘুম থেকে একটু বেলা করে ওঠা একটা

বিলাসের ব্যাপার। বাজার ওকে কোন দিনই করতে হয় না। বউদির হাতে মাসের মাইনেটা তুলে দিয়েই খালাস। বরং মাঝে-মধ্যে নিজের শখ-সাধের খাবারের কথা বউদির কানে তুলে দিয়ে বললে, ঠিক জুটে যায়। কিন্তু আজ সকাল সাতটাও বাজেনি, বউদি ঘরে এসে ডাকাডাকি শুরু করল, 'ঠাকুরপো, এই ঠাকুরপো, ওঠো, তোমার সঙ্গে এক ভদ্রলোক তার মেয়েকে নিয়ে দেখা করতে এসেছে।'

চাঁদ যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হল। গরমে সারা রাত ঘুম হয় না। ভোর-রাত থেকে ঘুমটা আসে। রবিবারে একটু বেলা অবধি, ঠাণ্ডায় বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকা যায়। ও ভাবল, কেউ হাত বা কোষ্ঠী দেখাতে এসেছে। চোখ না খুলে, পাশ ফিরে বলল, 'আঃ. কী যে জ্বালাতন! যে খুশি আসুক গে, আমি এখন উঠছি না।'

বউদি বলল, 'তা বললে কি হয়? তুমি নাকি কানের দুলের কী পোস্টার মেরেছ রাস্তায়? ওরা সেইজন্য খোঁজ নিতে এসেছে।'

চাঁদ ভুরু কুঁচকে চোখ তাকিয়ে বলল, 'এখন কি সকাল ন'টা বেজে গেছে নাকি?'

'তা কেন, এখন সাতটা সোয়া সাতটা হবে।' বউদি বলল, 'এই তো মাত্তর তোমার দাদা বাজারে বেরোল।'

চাঁদ খিঁচিয়ে উঠে বলল, 'কে ওদের এই সাত সকালে আসতে বলেছে? পোস্টারে টাইম তো দেওয়া আছে সকাল ন'টায়। বলে দাও ওদের এখন চলে যেতে।'

বউদি মশারিতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'তুমি কি সত্যি কানের দুল কুড়িয়ে পেয়েছ নাকি? কই, আমাকে বা তোমার দাদাকে বলনি তো?'

চাঁদ বউদির গলা শুনেই বুঝতে পারল, আর এক বিপত্তির সূচনা দেখা দিচ্ছে। আর বোধ হয় বিছানা আঁকড়ে, চোখ বুজে পড়ে থেকে, সকালের ঠাণ্ডা আমেজটা ভোগ করা হবে না। ও কিছু না বলে, চুপ করে রইল।

বউদি বলল, 'আজকাল আমাদের কাছে খুব চাপতে শিখেছ। বিয়ে না করেই এই, করলে পরে কী হবে, কে জানে!'

'দ্যুৎ, কী যে বল!' চাঁদ অন্য দিকে পাশ ফিরে, চোখ বুজল, 'এখন আমাকে একটু ঘুমোতে দাও, আর যারা এসেছে, তাদের ন'টায় আসতে বল।'

কিন্তু বউদি যে সহজে নড়বে না, চাঁদ তা ভালই জানে। বউদি আবার বলল, 'তুমি কী ভেবেছিলে, সোনার দুল কুড়িয়ে পেয়েছ শুনে, আমি নিয়ে নেব? না বলার কারণটা কী শুনি?'

ঘুমের আশা শেষ। তবু চাঁদ চোখ বুজে ঘাপটি মেরে পড়ে রইল। এই নতুন উপসর্গ এখন আবার কতখানি গড়াবে, কে জানে। এত ভেবে কি মানুষ কিছু করতে পারে?

বউদি আবার বলল, 'আমরা ঘরের মানুষ কিছু জানতে পারলাম না। আর রাজ্যের লোক জেনে গেল, চাঁদ হালদার সোনার দুল কুড়িয়ে পেয়েছে। শহরময় আবার পোস্টার পড়ে গেছে। এখন বাইরের লোকেরাই আপন হয়েছে, ঘরের দাদা-বউদি কেউ নয়। কেন, শুনি? আমাদের এত অবিশ্বাসের কারণ কী?'

চাঁদের পক্ষে আর শুয়ে থাকা সম্ভব হল না। ও সোজা হয়ে উঠে বসে, মশারির ভিতর থেকে, হাতজোড় করে বলল, 'ঘুম থেকে উঠে এই বাসিমুখে বলছি, আমি সে সব কিছুই ভাবিনি। যতীন খোকনদের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা করবার করেছি।'

'যতীন খোকনরাই তোমার পরামর্শের লোক হল?' বউদির অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পেল, 'আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা যায় না? সোনার কানের দুল কুড়িয়ে পেয়েছ, কবে পেয়েছ, একবারও তো মুখ ফুটে বলনি। পরামর্শ না হয় না-ই করতে, একবার বলতে কী হয়েছিল?'

চাঁদ ওর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল। 'ভুল হয়ে গেছে, মাইরি বলছি বউদি। তা নইলে, আমি কি তোমার কাছে কোন কথা লুকোই, বল?'

'রাজ্যের লোককে জানাতে পারলে, আর আমাদেরই বলতে ভুলে গেলে?' বউদি তথাপি শান্ত হল না, 'কবে তুল কুড়িয়ে পেয়েছ বল তো?'

চাঁদ ওর নিজের অজান্তেই আবার ভুল করে একটা সত্যি কথা বলল, 'সেই সেদিন, যেদিন বাড়ি ফিরে দেখলাম, তুমি আর দাদা চা তৈরী নিয়ে ঝগড়া করছ। কিন্তু বউদি, বিশ্বাস কর—'

'দাঁড়াও দাঁড়াও।' বউদি বাধা দিয়ে থামিয়ে, একটু ভেবে নিয়ে বলল 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সেদিন ছিল বুধবার। বুধ, বিস্যুদ, শুক্কুর, শনি আজ রবি, আজ পাঁচদিন। এই পাঁচদিনের মধ্যে একবারও তোমার মনে পড়ল না, আর শহরময় পোস্টার মেরে বেড়ালে?'

চাঁদ বলল, 'বুধবার এসেই তো বলতাম। তুমি আর দাদা যে রকম ঝগড়া করছিলে, তাই দেখেই আমার সব কেমন গুলিয়ে গেছল।'

'তারপরেও আর মনে পড়ল না?' বউদি তার ডাগর চোখে তীক্ষ্ণ অবিশ্বাস হেনে বলল, 'এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? নিজের বন্ধুদের বলতে তো ভোলনি?'

চাঁদ মিথ্যা কথা বলবার জন্য, হেসে বলল, 'আসলে কী জান বউদি—'.

'আমি তুলটা তোমার কাছ থেকে নিয়ে নিতাম, এই তো?' চাঁদকে চুপ করিয়ে দিয়ে বউদি বলে উঠল, 'বুঝেছি, সব বুঝেছি। তোমার দাদা শুনে কী বলে, তা দেখ। আমি আর কিছু বলতে চাই না। তবে আমরা যে তোমার পর, তা বুঝে নিয়েছি। আমাদের বলবে কেন? আমরা তোমার কে? এর পরে বিয়ে করলে না জানি আমাদের কী চোখে দেখবে।'

বলতে বলতে বউদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হায়, চাঁদের রবিবারের বিলাসী সকালের কী দশা! ঘুম ভাঙল গৃহ-বিবাদের সূচনা করে। এ বিবাদের পরিণতি কী, কে জানে। এখন ওর মনে হল, দাদা-বউদিকে কথাটা বললেই ভাল হত। একদিক থেকে, ভেবে দেখতে গেলে বউদির

অভিমান হওয়াটা বোধ হয় স্বাভাবিক। কিন্তু তখন যে গোপন রাখাই স্থির হয়েছিল।

চাঁদ আর ভাবতে পারে না। ও আবার শুয়ে পড়তে উদ্যত হয়েই, ঝটিতি সোজা হয়ে বসল। মুখ শক্ত হয়ে উঠল, দু চোখ রাগে ঝলকিয়ে উঠল। এই সাতসকালে লোকটা কে এসেছে, একটা মেয়েকে নিয়ে? ও লোকটাই যত নষ্টের মূল। আসবার কথা সকাল ন'টায়, কিন্তু রাত পোহাতে আর তর্ সয়নি।

কথাটা মনে হতেই, চাঁদ মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে, খাট থেকে নেমে, আলনার কাছ থেকে, তোয়ালে নিয়ে আদুড় গায়ে জড়িয়ে, ঘরের বাইরে গেল। সামনের বড় ঘরের বাইরে ছাদ ঢাকা চওড়া বারান্দা। সেখানে একটা টেবিল আর গোটা কয়েক বেতের চেয়ার আছে। বাইরের ঘরের দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা সেখানেই হয়। ও সেখানে এসে দেখল কালো রোগা লম্বা, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি মধ্যবয়স্ক লোক বসে আছে, অন্য চেয়ারে, কালো রোগা একটা মেয়ে, তাঁতের শাড়ি ফুলিয়ে পরে বসে আছে। চাঁদ খানিকটা মারমুখী হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, কী চাই আপনাদের?'

লোকটি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বলল, 'সোনার দুল।'

'কিসের সোনার দুল? কে বলেছে সোনার দুলের কথা?' চাঁদ ঝাঁঝিয়ে মুখিয়ে উঠল।

লোকটি তেমন বিচলিত না হয়ে বলল, 'আমরা কাল রাত্রে ইস্টিশনের বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি। আপনার নাম কি চন্দ্রনাথ হালদার!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার নাম চন্দ্রনাথ হালদার। তার জন্যে কী করতে হবে?' চাঁদের একই স্বর আর ভঙ্গি।

লোকটিরও কোন বিকার নেই, বলল, 'সোনার দুলটা নিতে এলুম।'

'কোন সোনার দুল-টুল আমি পাইনি।' চাঁদ ঝাঁঝিয়েই বলল।

লোকটি বলল, 'আপনি মশাই আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন

না, না? ওই আমার মেয়ে বসে আছে, ওকেই জিজ্ঞেস করুন। মশাই, সোনার এত দাম। মাত্র দু মাস আগে একজোড়া দুল গড়িয়ে দিয়েছি, এখনো বানির টাকা বাকি। সোনার টাকা তো আর বাকি রাখা যায় না, তা—'

'আরে দ্যুৎ মশাই আপনার সোনার টাকার নিকুচি করেছে। ওসব শোনার সময় আমার নেই!' চাঁদ হাঁকিয়ে বলল, 'পোস্টারটা ভাল করে পড়েছিলেন? অনুসন্ধানের জন্য বেলা ন'টায় আসার কথা। এখন এসেছেন কেন?'

লোকটি হলদে দাঁত দেখিয়ে বলল, 'কেন আর, হুতোশে। সোনার দুল বলে কথা। ক'টায় আসবার কথা লেখা ছিল বলুন তো?'

চাঁদ এবার সত্যি উত্ত্যক্ত রাগে ফেটে পড়ার উপক্রম করে বলল, 'সেটা কি আমাকে মুখে বলতে হবে? নিজে দেখে আসতে পারেননি? বেলা ন'টায় সময় দেওয়া হয়েছে।'

লোকটি চেয়ারে বসবার উদ্যোগ করে বলল, 'তা ন'টা অবধি থাকছি। দরকার হলে দশটা এগারোটা বারোটা, যতক্ষণ বলবেন, এখানে বসে থাকব, কী বলিস রে খুকী?' বলে মেয়ের দিকে তাকাল।

মেয়েটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। রাগে আর বিস্ময়ে চাঁদের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। লোকটার মস্তিষ্কে কিছু নেই নাকি? বলে বারোটা অবধি বসে থাকবে! ও এবার চেঁচিয়ে বলল, 'আরে মশাই বললাম তো, কোন কানের দুল আমার কাছে নেই।'

'নেই?' লোকটি এবার একটু অবাক হয়ে বলল, 'তবে পোস্টারে লিখেছেন যে? আর কাল বিকেলেই আমার মেয়ের কানের দুল হারিয়েছে। এমন আওপাতালি মেয়ে আমার—'

'আপনার মেয়ে কী পাতালি, তা আমার জানবার দরকার নেই।' চাঁদ ঝাঁঝালো চড়া স্বরেই বলল, 'পোস্টাবটা ভাল করে পড়েছিলেন? লেখাপড়া করেছেন তো?'

লোকটি বলল, 'অল্প-সল্প করেছি, পোস্টার পড়তে পারি। তা সে

কংগ্রেসের বলেন, আর কমিউনিস্টদেরই বলেন, সবাই—'

'থাক, থাক, আপনার বিত্তের কথা শোনার আমার দরকার নেই।' চাঁদ লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে হাঁকল, 'পোস্টারে কানের দুলের কথা লেখা ছিল না, কানপাশার কথা লেখা ছিল, বুঝেছেন? একটা কানপাশা পাওয়া গেছে, কানের দুল না। এবার আসুন।' চাঁদ বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য ফিরল।

'কিন্তু মশাই, শুনছেন।' লোকটি ডেকে উঠল, 'পাশাই বলুন আর দুলই বলুন, সবই তো সেই কানের ফুটোয় গলিয়ে পরতে হয়, অ্যাঁ? পাশাও যা দুলও তা-ই। গড়নের এদিক-ওদিক।'

চাঁদের ইচ্ছা হল, লোকটার গালে একটা থাপ্পড় কষায়। কিন্তু তা সম্ভব না। ও বাঘের মত লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কোন প্রমাণ আছে, যে দুলটি হারিয়েছেন?'

'তা আবার নেই? তা নইলে আপনি মানবেন কেন?' লোকটি মেয়ের দিকে ফিরে বলল, 'খুকী, স্যাকরার হিসেবটা বের কর্ তো।'

চাঁদ আবার ঝাঁঝিয়ে বলল, 'স্যাকরার হিসেবে আমার কোন দরকার নেই। দুলের জোড়ার আর একটা এনেছেন?'

'তাও এনেছি। স্যাকরার হিসেব সুদ্ধ নিয়ে এসেছি।' লোকটি বলল।

মেয়েটি একটি ছোট পেটমোটা মণিব্যাগের মত ব্যাগ বের করে, তার ভিতর থেকে বের করল ছোট একটি ন্যাকড়ার পুঁটলি। তার গিট খুলে, কাগজের মোড়ক খুলে বের করল, সোনার একটি পাতলা দুল, যার তলায় একটা লাল পাথর ঝোলানো। লোকটি সেটা সন্তর্পণে হাতে নিয়ে, চাঁদের সামনে তুলে ধরে বলল, 'মিথ্যে বলব না মশাই, মাত্তর দুমাস আগে—'

'কিছু যায় আসে না।' চাঁদ ধমক দিয়ে বলল, 'এরকম কোন সোনার দুল আমি পাইনি। আপনি এবার আসতে পারেন।'

লোকটি বলল, 'কিন্তু আমার মেয়ের দুল—'

'তা আমি কী জানি? বললাম তো এরকম কোন দুল আমি পাই-নি।'

'আপনার মালটা কি একবার দেখাতে পারেন?' লোকটি জিজ্ঞেস করল।

'না, সেটা আপনাকে আমি দেখাব না।' চাঁদ বলল, 'এখন আসুন।'

'কিন্তু আমি কী করে জানব, আপনি আমার দুলটাই পেয়েছেন কী না?' লোকটি আবার দাঁত দেখিয়ে হেসে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল।

চাঁদের এবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল, চিৎকার করে বলল, 'ঠাকুরের কাছে গিয়ে হত্যে দিন, তা হলেই জানতে পারবেন। এখন যান, বিদেয় হোন। বিদেয় হোন বলছি।'

চাঁদের ধমকে এবার মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটির কোন অপমান বোধ নেই। চোখে-মুখে অসহায় বিমর্ষতা ফুটে উঠল, মেয়েকে না ডেকেই চলে যেতে যেতে বলল, 'ভেবেছিলাম, কানের দুলের মতই একটা একটা করে সব গড়িয়ে দেব, বিয়ের সময় তাই দিয়ে গলার কাঁটা নামাব। কিন্তু তা আর কপালে নেই।'

মেয়েটি একবার করুণ চোখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে, বাবাকে অনুসরণ করে গেটের দিকে নেমে চলে গেল। চাঁদ গা থেকে তোয়ালেটা খুলে, জোরে একটা ঝাপ্‌টা দিয়ে বলল, 'শালা, কোথা থেকে সাতসকালে যত পাপ এসে উপস্থিত! পোস্টারটা ভাল করে পড়েওনি, আবার বলে কী না, আপনার মালটা দেখান।'

বলতে বলতে চাঁদ ঘরের মধ্যে ঢুকল। দেখল মালা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভিতর থেকে ওর দিকে আসছে। মালা মেয়েটি বাড়িতে কাজ করে, বয়স তেরো-চোদ্দ। কালো বোঁচা, বড় বড় চোখ, গায়ে ফ্রক। চাঁদকে বলল, 'তোমার চা।'

চাঁদ ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুই চা নিয়ে এলি কেন, বউদি কোথায়?'

'রান্নাঘরে বসে আছে।' মালা বলল, 'আমাকে বললে, তোমাকে চা দিতে।'

চাঁদ বুঝল, বউদির অসহযোগ পর্ব শুরু হল। তার মানে, এখন থেকে মৌনব্রতও বটে। যাকে বলে আড়ি। ইতিপূর্বেও অনেকবার এরকম হয়েছে। হার অবিশ্যি বরাবর চাঁদেরই হয়েছে। এখন দুশ্চিন্তার বিষয় হল, এ অসহযোগ পর্বের চেহারাটা কেমন হবে।

'ছোড়দা, তুমি একটা সোনার কানের দুল কুড়িয়ে পেয়েছ?' মালা জিজ্ঞেস করল।

চাঁদ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'কে বলল তোকে?'

'বউদি নিজের মনেই বলছে, তাইতে বুঝলাম।' মালা হেসে বলল।

চাঁদ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বউদি নিজের মনে কী বলছে?'

মালা একবার পিছনে দেখে, চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলল, 'বউদি খুব রেগে আছে। অনেক কথা বলছে, ভারি তো একটা সোনার দুল কুড়িয়ে পেয়েছে, তা আবার এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কিসের? সোনার দুল কি আমার নেই? না, কোনদিন পরিনি? আটজোড়া সোনার দুল বাক্সে পচছে, খুলেও দেখি না, আমাকে সোনার দুলের গুমোর দেখাচ্ছে। রাজ্যের লোককে ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে, ঘরে টুঁ শব্দটি নেই। এই সব বলছে।'

চাঁদ কোন জবাব না দিয়ে চা খেতে লাগল। বউদির রাগ ভাঙাবার জন্য কী উপায় বের করা যায়, তাই ভাবতে লাগল।

মালা জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি পেয়েছ ছোড়দা?'

'হুঁ।' চাঁদ অন্যমনস্ক ভাবে শব্দ করল।

মালা জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে সোনার দুলটা দিয়ে?'

চাঁদ বলল, 'কী আবার করব? যার জিনিস তাকে দিয়ে দেব।'

'কেন?' মালার স্বরে, চোখে মুখে পরম বিস্ময়।

চাঁদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কী করব?'

'কুড়িয়ে পেয়েছ, ওটা তো তোমার।' মালা বলল, 'কুড়িয়ে পাওয়া

জিনিস কেউ আবার দেয় নাকি ?'

চাঁদ জিজ্ঞেস করল, 'তবে কী করে ?'

'সে তোমার যা ইচ্ছে।' মালা চকচকে চোখে তাকিয়ে বলল, 'তুমি গরীব মানুষকে বিলিয়ে দিতে পার। ঠাকুর-দেবতাকে দিয়ে দিতে পার।'

চাঁদ গম্ভীর হয়ে বলল, 'হুঁ বুঝেছি, তুই এখন যা।'

মালা পা ঘষতে লাগল, বলল, 'কী করে তুমি জানবে, এটা কার জিনিস ?'

চাঁদ বলল, 'সে তুই বুঝবি না। আমার মশারিটা গুটিয়ে বিছানাটা ঠিক করে দে।'

মালা তথাপি দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলতে চায়, বলতে পারছে না। চাঁদ ওর দিকে তাকাল। মালার কানের শূন্য ছিদ্রের দিকে ওর চোখ পড়ল। এক পলকের জন্য মালার কানে, হীরের কানপাশা পরা ছবি ভেসে উঠল। বাইরে সাইকেলের টিং টিং ঘন্টা শোনা গেল। চাঁদ ফিরে দেখল, বারান্দার সিঁড়ির নিচে খবরের কাগজওয়ালা। ও কোন কথা না বলে, বাইরে বেরিয়ে গেল। রবিবারের সকালে কাগজ আসতে দেরি হয়। অন্যান্য দিন ভোরবেলাই বারান্দার টেবিলে কাগজ পড়ে থাকে।

চাঁদ খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে, চায়ের কাপ টেবিলে রেখে, স্বর চড়িয়ে বলল, 'মালা, আমার ঘর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা দে।'

মালা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে এল। চাঁদ খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে বলল, 'টেবিলের ওপরে রাখ্।'

মালা টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই রেখে বলল, 'ছোড়দা, তুমি যে আমার হাত দেখবে বলেছিলে ?'

চাঁদ ভুরু কুঁচকে মালার দিকে তাকাল। মালার কালো চোখ দুটিতে, বিশেষ কৌতূহল আর আশা-নিরাশার দোলা। চাঁদ হেসে বলল, 'তোর হাত না দেখেই আমি বলছি, এক বছরের মধ্যেই তোর

বিয়ে হবে। তখন আমি তোকে সোনার দুল দেব।'

মালার চোখ দুটি ঝকঝকিয়ে উঠল, এবং লজ্জায় হেসে উঠে, ঘরের ভিতরে চলে গেল। চাঁদ সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। আবার খবরের কাগজে চোখ ফেরাতেই, গেটে ঝনাৎ করে শব্দ হল। দেখা গেল, সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে বাজারের থলি ঝুলিয়ে, গলদঘর্ম দাদা ঢুকছে। গেটের কাছ থেকেই চাঁদকে দেখতে পেয়ে বলল, 'এই চাঁদ, তুই নাকি সোনার কানপাশা কুড়িয়ে পেয়েছিস, আর তার জন্য সব জায়গায় নোটিস ঝুলিয়েছিস?'

দাদা সাইকেলসুদ্ধ বারান্দায় উঠে এল। চাঁদ হাসতে গিয়ে কেমন অপরাধী বোধ করল নিজেকে, বলল, 'হ্যাঁ। তুমি কোথায় শুনলে?'

'বাজারে দু-একজন আমাকে বলছিল।' দাদা বলল, 'কই, কিছু বলিসনি তো? কবে, কোথায় পেলি?'

চাঁদ মুহূর্তের মধ্যেই মনস্থির করে নিল, দাদাকে ব্যাপারটা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে বলে, তার মেজাজ খারাপ না করার সুযোগ নেওয়া। বলল, 'পেয়েছি দুদিন আগেই। ইচ্ছে করেই সকলের কাছে চেপে গেছি, কেন বুঝলে তো?'

'কেন?' দাদা অপ্রসন্ন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল।

চাঁদ বলল, 'লোক চিনতে তোমার বাকি নেই দাদা, আমি জানি। একটু জানাজানি হলেই, সবাই আমার আমার বলে ছুটে আসত। এই ধরো পাঁচু জ্যাঠা, বা নতুন ঠাকুমা, এরা এসে কানপাশাটা দেখতে চাইত, আর সবাইকে বলে বেড়াত, কানপাশাটা দেখতে কেমন। জানাশোনা লোকেরা এসে দেখতে চাইলে, না দেখিয়ে পারা যেত না। তাই ভাবলাম, একেবারে পোস্টার দিয়ে জানিয়ে দেব, তারপরে যার জিনিস সে প্রমাণ দেখিয়ে নিয়ে যাক। ঠিক করিনি দাদা?'

দাদা একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক কাজ করেছিস। কানপাশাটা আগে থেকে কারোকে দেখানো ঠিক নয়। ভোগা দেবার লোক অনেক আছে।'

'তোমাকে আমি কানপাশাটা এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি।' চাঁদ বলল, 'এ তো আমাদের ঘরের ব্যাপার।'

দাদা বলল, 'ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, পরে দেখব। বাজারে লোকের মুখে শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। চাঁদ কানপাশা কুড়িয়ে পেয়েছে, অথচ আমি জানি না? এখন বুঝতে পারছি, চেপে গিয়ে ভাল করেছিস।'

চাঁদ মনে মনে 'জয় মা' বলে বলল, 'বউদিকেও বলিনি।'

'ঠিক করেছিস।' দাদা বলল, 'মেয়েরা পেটে কথা রাখতে পারে না। কার কাছে কী গল্প করে বসত কে জানে।'

দাদা সাইকেলের হ্যাণ্ডেল থেকে বাজারের থলি নামাবার আগেই, চাঁদ থলি নিজের হাতে তুলে নিল। সামনের ঘরে ঢুকে ডাকল, 'মালা কোথায় গেলি? বাজারগুলো নিয়ে যা।'

মালা চাঁদের ঘরে বিছানা তুলতে তুলতে বেরিয়ে এল। চাঁদ ওর হাতে বাজারের থলি দিয়ে, আবার দাদার সামনে গিয়ে বলল, 'এই তো একটু আগেই একটা লোক তার মেয়েকে নিয়ে এসেছিল, বলে কানের দুল হারিয়েছে। লোকটা কানপাশা আর কানের দুলের তফাত বোঝে না।'

দাদা বলল, 'খুব বোঝে। ও সব হল ভোগা দেবার তাল। ও রকম অনেক আসবে, কিন্তু খবরদার, কেউ যেন ঠকিয়ে নিয়ে না যায়।'

দাদা চাঁদের সিগারেটের প্যাকেট থেকেই, একটা সিগারেট নিয়ে, দেশলাই জ্বেলে ধরাল। চাঁদ বলল, 'সে ব্যাপারে আমি হুঁশিয়ার আছি। পোস্টার দিয়ে ভাল করিনি দাদা? পরের জিনিসে আমরা লোভ করব কেন?'

'কখনো করব না।' দাদা বলল, 'আমাদের মান-মর্যাদা আছে, কত বড় বংশ আমাদের! পরের জিনিসে আমরা কখনো লোভ করতে পারি! তাও কী না একটা সামান্য কানপাশা।'

চাঁদ দাদার হাতে খবরের কাগজটা তুলে দিল। এ সময়েই বউদি থমথমে গম্ভীর মুখ নিয়ে এসে উপস্থিত হল, বলল, 'তোমার ভাইয়ের

কাণ্ড শুনেছ তো?'

দাদা সব জেনেও অবাক হয়ে বলল, 'কী কাণ্ড?'

বউদি বলল, 'উনি পাঁচদিন আগে সোনার দুল কুড়িয়ে পেয়েছেন, আর শহরময় পোস্টার দিয়ে জানিয়েছেন, কিন্তু তুমি আমি যে ঘরের লোক, আমাদের কাছে একটি রা কাড়েনি।'

'বেশ করেছে।' দাদা বলল, 'জানাজানি না করে ভাল কাজ করেছে।'

বউদির রুষ্ট চোখে চকিত বিস্ময়ের ঝিলিক খেলে গেল, চাঁদকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, 'ও, তুমি তাহলে আগেই জানতে, আমাকে চেপে গেছ?'

'মোটেই না। আমি তো বাজারে গিয়ে পোস্টারের কথা শুনলাম। আমিও অবাক হয়েছিলাম, তারপরে ভাবলাম, চাঁদ ঠিক কাজই করেছে।'

বউদি রাগে দীপ্ত হয়ে উঠল, বলল, 'ঠিক কাজ করেছে? পৃথিবীর লোককে ঢাক পিটিয়ে জানাতে পারে, আর আমাদের বলতে পারে না? এটা ঠিক কাজ?'

'ওসব তুমি বুঝবে না।' দাদা খবরের কাগজে চোখ রেখে বলল।

বউদি জ্বলে উঠে বলল, 'কী বুঝব না, শুনি? ভাইয়ের হয়ে খুব তো সাউখুড়ি করছ। যে-কথা বাইরের লোকে জানতে পারে, সে-কথা আমরা জানতে পারি না? কানের দুল কি আমরা কেড়ে নিতাম? এর পরে শুনব, লোকে এসে বলছে, তোমার ভাই অমুক মেয়েকে বিয়ে করেছে।'

দাদা হেসে বলল, 'তাই আবার কখনো হয় নাকি? পিটিয়ে ওর হাড় মাস আলাদা করব না? কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস আর বিয়ে, এক কথা নয়।'

'দুই কথাটা কী, তাই আমাকে বুঝিয়ে বলো, শুনি?' বউদি রীতিমত রণং দেহি রূপ ধারণ করে বলল, 'যে-কথা বাইরের লোককে বলা যায়, ঘরের লোককে তা বলবে না কেন? বললে কি আমরা সোনার

ফুল কেড়ে নিতাম ?'

দাদা এবার ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে বউদির দিকে তাকাল। চাঁদ বুঝল, এবার এখান থেকে ওর বিদায় নেওয়া দরকার। ও তাড়াতাড়ি সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নিয়ে সরে পড়ল। যেতে যেতে শুনল, দাদা বিরক্ত স্বরে বলছে, 'তুমি বারে বারে কেড়ে নেবার কথা বলছ কেন, বুঝতে পারছি না। কে বলেছে তুমি কেড়ে নিতে ? চাঁদ ?'

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বউদির ঝাঁঝালো স্বর শোনা গেল, 'মুখে বলতে হবে কেন, ব্যবহারেই তো বুঝতে পারছি। তা নইলে—'

চাঁদ বাথরুমের দরজা বন্ধ করল।

চাঁদ স্নান করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে কারোর কোন সাড়া-শব্দ পেল না। ব্যাপার কিছু বুঝবার আগে, ও প্রায় দৌড়েই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। গায়ে কিঞ্চিৎ পাউডার ছড়িয়ে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে, চুল আঁচড়ে নিল। এবার জলখাবারের পাট। গোলমাল সেখানেই। খেতে দেবে বউদি। কিন্তু বাড়িটা আশ্চর্য রকম নিঝুম লাগছে। ক্ষ্যাপা-ক্ষেপী দুজনেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল নাকি ? সে তো আর এক সর্বনাশ ! কানপাশা নিয়ে গৃহে অশান্তি।

চাঁদ আস্তে আস্তে দরজা খুলল। সামনের ঘরে কেউ কোথাও নেই। সামনের ঘরে পা দিয়েই ও দেখতে পেল, টেবিলের ওপরে জলখাবার ঢাকা দেওয়া। তার মানে, বউদি বাড়ির ভিতরেই আছে। ও একবার দরজার কাছে গিয়ে বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখল। দাদা নেই,

নাইকেলও নেই। এর একটাই অর্থ, বাতাসে বারুদের গন্ধ। যে-কোন মুহূর্তেই আগুন জ্বলতে পারে। চাঁদ সরে এসে, জলখাবারের ঢাকনা খুলল। পরোটা আর তরকারি, বউদির হাতে তৈরি ক্ষীরের ছাঁচ। খাওয়ার ব্যাপারটা অপরিহার্য ভেবে, ও তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করল। কারণ, আজ রান্না হবে কী না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

চাঁদের খাওয়ার মাঝখানেই মালা চায়ের কাপ নিয়ে এল। ওর চোখে-মুখে একটা সন্ত্রস্ত ভাব। চাঁদ ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'বউদি কোথায় রে?'

মালাও গলা নামিয়ে বলল, 'জানি না। আমাকে বললে, তোমাকে চা করে দিতে। তারপরে কোথায় যেন গেল।'

'আমার জলখাবার কে দিলে?' চাঁদ জিজ্ঞেস করল।

মালা বলল, 'বউদি।'

'আর দাদা কোথায় গেল?'

মালা একবার পিছন ফিরে দেখে নিয়ে বলল, 'বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তা-ই ঘটেছে। চাঁদ তাড়াতাড়ি খেতে খেতে, গৃহ-অশান্তি মেটাবার উপায় ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে খাওয়া শেষ হল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই ওর মাথায় একটা চিন্তা এল। দাদাকে মোটামুটি ঠিক রাখা গিয়েছে। এখন বউদিকে কানপাশাটা দেখিয়ে দিলেই তো হয়। বউদির অভিমান তো একটাই, কেন বলা হয়নি? এখন ক্ষমা চেয়ে, কানপাশাটা তাকে দেখিয়ে দিলেই, সঙ্কট মোচন হতে পারে। ও মালাকে বলল, 'তুই একটু এদিক-ওদিক ছাখ, বউদি কোথায় গেল। দেখতে পেলে আমাকে এসে বলবি।'

মালা ভীরু অসহায় স্বরে বলল, 'দেখতে তো হবেই। মাছ তরি-তরকারি সব বাজারের ব্যাগের মধ্যে পড়ে আছে, এখনো খোলা হয়-নি। বউদি না বলে দিলে আমি কিছু কুটতে কাটতে পারব না।'

চাঁদ আঁতকিয়ে উঠে বলল, 'রান্নাঘরে মাছের থলে পড়ে আছে? শীগ্‌গির যা, ছাখ্‌ এতক্ষণে বেড়ালে সাবড়ে দিল কী না।'

মালাও ভয়চকিত হয়ে দৌড়ে ভিতরে চলে গেল। চাঁদ চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে একবার বউদির ঘরের দিকে তাকাল। ভিতর দিকে দেখা যাচ্ছে না। ও সিগারেট ধরিয়ে, বউদির ঘরের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ করতেই, বাইরের বারান্দার দিক থেকে একটি মেয়ের স্বর ভেসে এল, 'কই, চাঁদদা কোথায়?'

চাঁদ ফিরে তাকিয়ে দেখল, বারান্দার নিচে, কাঞ্চনগাছের ছায়ায় সান্টি আর মান্টি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, চোখের তারা ঘুরিয়ে হাসছে। ফেলু পালের সেই মেয়ে দুটো। ওরা বাইরে থেকে চাঁদকে দেখতে পাচ্ছে না। নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কী বলাবলি করছে, আর মুখে হাত চাপা দিয়ে, এ ওর গায়ে খোঁচা দিয়ে, হাসতে বারণ করছে।

চাঁদের আর বউদির ঘরের দিকে যাওয়া হল না। ভাবল, এ মেয়ে দুটো আবার কী মনে করে? হাত দেখাতে এসে বেশ কয়েকবার জ্বালাতন করেছে। পাড়ার ছেলেদের পিছনে লাগবার জুড়ি নেই ওদের মত। ফেলু পাল চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। এ দু মেয়ে কোনদিন পার করতে পারবে কী না সন্দেহ। এখনো দুটো ছোট ছেলেকে মানুষ করার দায়িত্ব আছে। সান্টি আর মান্টি নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে, বারান্দায় উঠে এল। পিঠোপিঠি কুড়ি-আঠারোর মধ্যে দুজনের বয়স। দেখতে তেমন রূপসী না হলেও, দুজনেরই আল্‌গা চটক আছে। একহারা, উজ্জ্বল, হাসি-খুশিতে টলটলে। বারান্দায় উঠে মান্টি স্বর তুলে ডাকল, 'চাঁদ-দা! চাঁদ-দা আছেন?'

চাঁদ দরজার কাছে এগিয়ে, গম্ভীর হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? কী চাই? আজ আমি হাতটাত দেখতে পারব না।'

সান্টি ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বলল, 'হাত দেখাতে আসিনি, আমার হারিয়ে যাওয়া কানপাশাটা নিতে এসেছি।'

মান্টি বলল, 'আমারও এক কানের কানপাশা হারিয়ে গেছে চাঁদ-দা। সান্টির কথা আমি জানি না।'

সান্টি মান্টির ঘাড়ে চাঁটি মেরে বলল, 'জানিস না মানে ? আমরা তুজনেই তুজনেরটা জানি।'

চাঁদ সন্দিগ্ধ চোখে তুজনের দিকে তাকাল। তুজনের চোখে কৌতুকের ঝিলিক, রুদ্ধ হাসি থমকিয়ে আছে। ও বলল, 'হারাল তো হারাল, তু বোনেরই হারাল ?'

সান্টি বলল, 'সত্যি বলছি চাঁদ-দা, এই ক'দিন হল আমার একটা কানপাশা কান থেকে খুলে পড়ে গেছে।'

'আমারটা হারিয়েছে দিন সাতেক আগে।' মান্টি বলে, চোখের কোণে একবার সান্টিকে দেখে নিল।

সান্টি একেবারে চাঁদের গায়ের কাছে এসে বলল, 'ওসব আমি জানি না চাঁদ-দা, কুড়িয়ে পাওয়া কানপাশা নিশ্চয় আমার। আপনি ওটা আমাকে দিয়ে দিন।'

চাঁদ সরে যাবার আগেই, মান্টি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, চাঁদের একটা হাত চেপে ধরল, বলল, 'না না, সান্টির কথা আপনি শুনবেন না চাঁদ-দা। আপনি যেটা কুড়িয়ে পেয়েছেন, সেটা আমারই।'

সান্টি তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে, মুখ বাড়িয়ে দিল চাঁদের মুখের কাছে, বলল, 'ইস্। চাঁদ-দা কখখনো তা দেবেন না। দিতে হলে চাঁদ-দা আমাকেই দেবেন, তাই না চাঁদ-দা ?'

সান্টির নিশ্বাসের স্পর্শ লাগল চাঁদের গালে। তুই বোনের চুলের আর শরীরে সুবাস লাগছে ওর ঘ্রাণে। ও রেগে উঠতে গিয়েও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মান্টি তো রীতিমত ওর গা ঘেঁষেই রয়েছে। চাঁদ এসব কল্পনাই করতে পারে না। এ সময়েই বাড়ির ভিতরের দরজার কাছে একটা শব্দ শুনে, চাঁদ মুখ তুলে দেখল, বউদি জ্বলন্ত তুই চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, ঝটিতি সরে গেল। সেই মুহূর্তেই বাইরের বারান্দার কাছ থেকে যতীনের স্বর শোনা গেল,

'কই রে চাঁদ, কী করছিস ?'

চাঁদ বিভ্রান্তের মত বাইরের দিকে দেখল। যতীনের সঙ্গে শম্ভুও বারান্দায় উঠে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। শম্ভু ঠোঁট টিপে বলল, 'চাঁদ দেখছি বিশেষ ব্যস্ত রয়েছে! চল যতীন, এখন যাই, পরে আসব।'

চাঁদ এবার যেন খানিকটা নিজেকে ফিরে পেল, হুমকে উঠে বলল, 'থাক আর ইয়ারকি মারতে হবে না। আমি মোটেই বিশেষ ব্যস্ত না।'

মান্টি চাঁদের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি দিন চাঁদ-দা। আপনার বন্ধুরা এসে গেছে, আমরা পালাই।'

চাঁদ ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, দু পা সরে গিয়ে, ধমকের সুরে বলল, 'দেবটা কী, শুনি ? তোমাদের কানপাশা হারিয়েছে, তার প্রমাণ কী ? এমনি বললেই আমি দিয়ে দেব ?'

সান্টি দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখছেন তো যতীনদা, চাঁদ-দা আমাদের কী রকম অবিশ্বাস করছে ? সামান্য কানপাশার জন্য আমরা মিথ্যে কথা বলব ?'

শম্ভু আর যতীন চোখাচোখি করল। শম্ভু বলল, 'তোমাদের দুজনেরই কানপাশা হারিয়েছে ?'

সান্টি জবাব দিতে গিয়ে বিষম খেয়ে, মুখে হাত চাপা দিল। চোখে রুদ্ধ হাসির ঝিলিক। মান্টি বলল, 'সান্টির হারিয়েছে কী না জানি না, আমার হারিয়েছে। চাঁদ-দা আমাকে খুব ভালবাসে, ঠিক দিয়ে দেবে।'

'কাঁচকলা দেব।' চাঁদ চিৎকার করে বলল, 'চালাকি পেয়েছ, না ? তোমরা এসে বলবে, আর আমি অমনি সুড় সুড় করে কানপাশা দিয়ে দেব! ওসব ভালবাসা-টাসা জানি না। হারানো কানপাশার জোড়ার আর একটা নিয়ে এসে প্রমাণ দাও, তারপরে কথা।'

সান্টি ঠোঁট উলটে বলল, 'চাঁদ-দা, আপনি ভালবাসা জানেন না ?'

মান্টি হাসি চাপতে না পেরে, ফিক করে হেসে উঠে মুখে হাত চাপা দিল। চাঁদ বলল 'না, জানি না। একরত্তি মেয়ে, আমাকে ভালবাসা শেখাতে এসেছ! আমি এখুনি ফেলুকাকার কাছে যাচ্ছি।'

'আমরা একরত্তি মেয়ে ?' মান্টি বলে উঠেই খিল খিল করে হেসে উঠল।

সান্টি বলল, 'চাঁদ-দা, ভালবাসা বুঝি আবার শেখাতে হয় ?'

প্রচণ্ড রাগে চাঁদের মুখে কথা যোগাল না। ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তাকাল যতীন আর শম্ভুর দিকে। শম্ভু আর যতীন নিজেদের মধ্যে অসহায় দৃষ্টি-বিনিময় করল।

মান্টি বলল, 'বাবাকে এখন বাড়িতে পাবেন না। তা ছাড়া, কানপাশা হারাবার কথা তো আমরা বাড়িতে বলিনি। বললেই তো তুলকালাম লেগে যাবে।'

সান্টি বলল, 'ঠিক বলেছিস মান্টি, এ কথাটা আমার মাথায় আসেনি।'

যতীন এগিয়ে এসে শান্তভাবে বলল, 'সান্টি, কী করে তোমার মাথায় আসবে ? সবই তো তোমাদের মনগড়া, মজা করা। মতলবটা ভালো ভেঁজেছ।'

সান্টি অবাক চোখ বড় করে বলল, 'একি বলছেন যতীনদা ?'

মান্টিও সেরকম কিছু বলতে গেল, কিন্তু ওর উচ্ছ্বসিত প্রগল্‌ভ হাসি কথা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হাসতে আরম্ভ করল সান্টিও, তবু মান্টিকে গায়ে ধাক্কা দিয়ে, ওর হাসি থামাবার চেষ্টা করল। চাঁদ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'এটা কি ফার্স করার জায়গা ? তোমরা কী ভেবেছ ?'

সান্টি মান্টির হাসি আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ওদের হাসি দেখে, যতীনের হাসি পেল। তা সংক্রামিত হল শম্ভুর মধ্যে, সেও হাসতে লাগল। চাঁদ ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে সকলের হাসিমুখের দিকে দেখতে লাগল।

সান্টি হাসতে হাসতে, মান্টির হাত ধরে বলল, 'চাঁদ-দার মনটা বড় শক্ত। চল্‌ মান্টি যাই। চাঁদ-দা কানপাশা দেবে না।' বলে মান্টির হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে চলে গেল, এবং বারান্দার নিচে নেমে আবার বলল, 'ঠিক আছে চাঁদ-দা, কানপাশাটা আমাদের দিলেন না। শহরের

সব মেয়েদের আমরা এখানে পাঠিয়ে দেব।'

দুজনেই অদৃশ্য হল। শম্ভু বলল, 'কী সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা!' বলেই আবার হাসতে আরম্ভ করল।

চাঁদ ধমক দিয়ে বলল, 'শম্ভু, হাসতে হয়, অন্য জায়গায় গিয়ে হাস্, আমার সামনে না। আমি সকাল থেকে জ্বলে মরছি, আর ও মজা পেয়ে হাসছে!'

যতীন নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, 'কেন সকাল থেকে কী হল?'

'কী হয়নি?' চাঁদ বলল, 'দাদা-বউদিতে ঝগড়া হয়ে গেছে। এই কানপাশার ব্যাপার নিয়ে। বউদির রাগ—কেন আগে থেকে বলিনি। দাদা অবিশ্যি আমার যুক্তি মেনে নিয়েছে, তাই ঝগড়া। একটা লোক তার মেয়ে আর একটা দুল নিয়ে এসে বলে, দুল ফিরিয়ে দিন। শালা, লেখাটাও ভাল করে পড়েনি। তারপরে এই মেয়ে দুটো, ওহ্!' চাঁদ কপালে মাথায় কয়েকটা চাপড় দিল।

শম্ভু বলল, 'কেন যেচে বাঁশ নিতে গেলি?'

'যেচে বাঁশ, মানে?' চাঁদ রুখে উঠল।

শম্ভু বলল, 'তাছাড়া আর কী? অনেস্টি দেখাবার জন্য পোস্টার সাঁটতে গেলি, এখন এইসব ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে। কী দরকার ছিল? কানপাশাটা ঝেড়ে দিয়ে—'

'এই শম্ভু, চুপ কর্।' যতীন শম্ভুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'অনেস্ট লোকদেরই ঝামেলা পোয়াতে হয় বেশি। পরের জিনিস, ঝেড়েই বা দেবে কেন। কিন্তু বাড়িতে গোলমাল হলে মুশকিল। দাদা-বউদির ঝগড়াটা কেমন করে মেটানো যায়, সেটা একটু ভেবে দেখতে হবে। চল্ বারান্দায় গিয়ে বসি।'

তিনজনেই বারান্দায় গেল। চাঁদ বলল, 'আমার কিছুই ভাল লাগছে না। কেন যে মরতে কানপাশাটা আমার চোখেই পড়ল।'

শম্ভু বলল, 'কপালে ভোগান্তি আছে বলে। আমার চোখে পড়লে অন্যরকম হত।'

যতীন ধমক দিল, 'তুই থাম্ তো, খালি এক কথা।'

এই সময়ে গেটের কাছে, খোকনের গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, আসুন, এ বাড়িই সেই বাড়ি।'

দেখা গেল, খোকন আর নিমাই এক বিধবা বৃদ্ধাকে পথ দেখিয়ে, গেট খুলে ভিতরে নিয়ে আসছে। বৃদ্ধা আপন মনে বক বক করছেন, 'খবর পেয়েই ছুটতে ছুটতে আসছি। নাতনী তো না, একটা দস্যি মেয়ে। সেই আমার বে'র সময়ের কানপাশা।'

বারান্দা থেকে চাঁদ যতীন শম্ভু দেখল। খোকন বলল, 'চাঁদ, উনি এসেছেন কানপাশার খোঁজে।'

বৃদ্ধা নিজে থেকেই বারান্দায় উঠতে উঠতে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমি বুড়ি মানুষ, একলাই এসেছি। সোনা-দানা হারানো বড় অমঙ্গলের কথা। নাতনীর কান থেকে কানপাশা হারাবার পর থেকে মনটা বড় খারাপ ছিল। আজ সকালে পাড়ার ভণ্ডুল গিয়ে খবর দিল, শুনে অ্যাদ্দিনে যেন গায়ে জল লাগল। সেই কদ্দূর থেকে আসছি। রোববারেও বাসে কী ভিড়! কই, কে বাবা চন্দ্র হালদার?'

সবাই চাঁদের দিকে তাকাল। বৃদ্ধা সকলের মুখের দিকে উৎসুক চোখে দেখলেন। যতীন বৃদ্ধাকে বলল, 'আপনি চেয়ারে বসুন। কোথা থেকে আসছেন?'

বৃদ্ধা বললেন, 'তা বাবা অনেক দূর থেকে। নিত্যানন্দ কলোনী থেকে আসছি। কাল রাত্রেই ইস্টিশনের নোটিস পড়ে, ভণ্ডুল আমাকে গিয়ে বলেছে। বসব না আর। কানপাশাটা নিয়েই পালাব।'

চাঁদ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'হারানো কানপাশার আর একটা এনেছেন?'

বৃদ্ধা হাতের রুমালের গিঁট খুলতে খুলতে বললেন, 'তা আর আনিনি বাবা? জোড়ার একটা না আনলে, তোমরা বুঝবে কেমন করে? প্রমাণ তো চাই।'

চাঁদ সকলের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল। বৃদ্ধা কাঁপা কাঁপা হাতে

রুমালের গিঁট খুলে, একটি কানপাশা সকলের চোখের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'এই হচ্ছে জোড়ার আর একটা। অনেক কালের সাবেকী জিনিস। আজকালকার মত ঠুনকো হালকা না।'

কথাটা মিথ্যা না। বেশ ভারি, ছিলে-কাটা সোনার গোল কান-পাশা। মাঝখানে একটি মুক্তো বসানো। চাঁদের দিকে সবাই তাকাল। চাঁদ মাথা নাড়িয়ে বলল, 'আমি যে কানপাশা পেয়েছি, এটার সঙ্গে সেটার মিল নেই।'

'নেই?' বৃদ্ধা অসহায় হতাশ চোখ তুলে চাঁদের দিকে তাকালেন, তাঁর মুখের হাঁ খুলে গেল।

চাঁদ বলল, 'আজ্ঞে না। আমি যেটা পেয়েছি, সেটা অন্যরকম।'

বৃদ্ধা হতাশভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, কানপাশাটি আবার কাঁপা হাতে রুমালে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'আমার মনেও একটু সন্দেহ ছিল। নাতনী তো আমার এ তল্লাটে বিশেষ আসে না। বায়স্কোপ দেখতে-টেখতে আসে। ওটা পুকুরের জলেই গেছে। যা দস্যি মেয়ে।'

চাঁদ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাতনী কি কলেজে পড়ে?'

'না বাবা, কলেজে-টলেজে পড়ে না।' বৃদ্ধা বললেন, কোনরকমে ইস্কুলের পাসটা দিয়েছে। এখন পাত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি। তা চন্দ্র হালদারটি কে?'

যতীন চাঁদকে দেখিয়ে বলল, 'এর নাম চন্দ্রনাথ হালদার।'

বৃদ্ধা চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বাবা খুব ভাল ছেলে। পরের জিনিসে তোমার লোভ নেই, নইলে কাগজে লিখে দেওয়ালে দেবে কেন? ও রকম লোক কি আজকাল আছে? তা বে-থা করেছ?'

খোকন বলল, 'কোথায় আর হল ঠাকুমা।'

বৃদ্ধা বললেন, 'আহা, অমন করে বোল না ভাই। এমন ছেলের বে' কি কখনো আটকে থাকে? তা হ্যাঁ বাবা চন্দ্রনাথ, তোমাদের কী গোত্তর?'

চাঁদ ছাড়া সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। যতীন বলল, 'শুধু

গোত্র চান, না আরো কিছু চান ?'

বৃদ্ধা বললেন, 'হালদার বললে তো ? আমি তো বামুনের ছেলে বলেই আন্দাজ করছি।'

যতীন বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। ওদের ভরদ্বাজ গোত্র।'

'বাহ্, বেশ ভাল।' বৃদ্ধা সপ্রশংস উৎসুক চোখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা ভাই তোমার কী করা হয় ? মাইনে-পত্তর কেমন পাও ? বাপ-মা আছে ? ক' ভাই-বোন ?'

কেউ কোন জবাব দেবার আগেই, বউদি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। হাতের ট্রেতে পাঁচ কাপ চা থেকে ধোঁয়া উঠছে। চোখে-মুখে হাসির ঝলক। বলল, 'বাপ-মাকে খেয়ে বসে আছে। দুই ভাই দুই বোন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে বেতন পায় মাসে আটশো টাকা। কিন্তু পাত্রী ঠিক হয়ে আছে, বুঝলেন ?' বলে সকলের দিকে দেখে বলল, 'যতীন ঠাকুরপো, তোমাদের জন্য চা নিয়ে এলাম।'

যতীন বলল, 'আহ্, এই না হলে আর বউদি।'

বৃদ্ধা অবাক চোখে পরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কে মা ?'

'আমি এ বাড়ির বড় বউ।' পরী বলল, 'আর কানপাশা কুড়িয়ে পেয়েছে আমার দেওর।'

বৃদ্ধা বললেন, 'অ। তোমার দেওরের পাত্রী ঠিক হয়ে আছে ?'

বউদি টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রাখতে রাখতে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আমি আমার নাতনীর কথা ভেবে বলছিলাম।' বৃদ্ধা বললেন, 'তা বেশ ভাল। তোমরা সবাই সুখে থাকো। আমি চলি।'

নিমাই জিজ্ঞেস করল, 'ঠাকুমা, আপনার নাতনী দেখতে কেমন ?'

চাঁদ ভ্রূকুটি চোখে নিমাইয়ের দিকে তাকাল। বৃদ্ধা বললেন, 'তা যদি বল ভাই, নিজের নাতনী বলে বলছি না, সে বেশ রূপসী মেয়ে। বয়স এই আঠারো-উনিশ হল। আমাদের শাণ্ডিল্য গোত্র, নাতনী একটা পাস দিয়েছে। একটা মাত্তর নাতনী, দেওয়া-থোয়া কিছু কম হবে না। তা পাত্রী যখন ঠিক হয়েই আছে, কী আর বলব ?'

বৃদ্ধা বারান্দা থেকে নেমে আবার বললেন, 'ঠিকানা তো জানাই রইল। যদি মনে কর, আমার নাতনীকে একবার দেখে এসো। আজকালকার মেয়েদের মত বার-টান তার নেই। মেয়ের মেষ লগ্ন, মিথুন রাশি। ছেলের রাশি লগ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো।' বলতে বলতে বৃদ্ধা চলে গেলেন।

বউদি হেসে বলে উঠল, 'বুড়ি এসেছে কানপাশার খোঁজে, তার মধ্যেই নাতনীর টোপ্ ফেলছে।'

যতীন বলল, 'কিন্তু বউদি, চাঁদের যে পাত্রী ঠিক হয়ে আছে, একথা তো আমরা জানি না?'

বউদি বলল, 'বুড়ি যে-রকম জাঁকিয়ে বসবার তাল করছিল, ও-কথা না বলে উপায় কী ছিল। তবু তোমাদের নেমন্তন্ন করে গেল, নাতনীর চাঁদমুখ দেখে আসতে।'

বলে বউদি চাঁদের দিকে এক পলক দেখে, হাসতে হাসতে ভিতরে চলে গেল। চাঁদের মনে হল, ওর মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। ধারণা করেছিল, বউদি প্রচণ্ড রেগে আছে। অনেক সাধ্যসাধনা করে মান ভাঙাতে হবে। কিন্তু এ বউদি যেন সেই বউদিই নয়। চাঁদের বন্ধুদের জন্য নিজের হাতে চা করে দিয়ে গেল, স্বাভাবিক অবস্থাতেও যা প্রায় ঘটে ওঠে না। রহস্যটা কী, চাঁদ কিছুই বুঝতে পারল না।

যতীন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'কী রে চাঁদ, তুই যে বলছিলি, বউদি ঝগড়া করেছে, খুব রেগে আছে? বেশ তো হাসি-খুশি দেখলাম।'

'তা তো আমিও দেখলাম।' চাঁদ বলল, 'কিন্তু এটা তো হবার কথা নয়। দাদার সঙ্গে ঝগড়া চলছে, নিজের কানে শুনতে শুনতে আমি

বাথরুমে গেছি। তারপরেও মালা নিজের হাতে আমাকে চা তৈরি করে দিয়েছে, বউদি দেয়নি। মালার মুখেই শুনলাম, দাদা ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। অথচ—'

'বউদি বেশ খোশমেজাজেই আছে।' খোকন বলল, 'মেয়েদের বুঝতে চেষ্টা করে লাভ নেই, এটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।'

কিন্তু চাঁদ কিছুই বুঝতে পারল না। বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে রইল।

গেটের কাছ থেকে মোটা গম্ভীর পুরুষ-স্বর ভেসে এল, 'চন্দ্রনাথ হালদার এ বাড়িতে থাকেন?'

শম্ভু মুখ বাড়িয়ে বলল, 'থাকেন।'

একজন মোটাসোটা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক গেট খুলে বললেন, 'উনি কি বাড়ি আছেন?'

'আছেন।' নিমাই বলল, 'কি দরকার?'

'কানপাশা।' ভদ্রলোক গেটের কাছ থেকে বারান্দার দিকে এগিয়ে এলেন।

চাঁদ আর ওর বন্ধুরা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল। ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি কিছুটা জেনারেলের মত। অর্থাৎ জাঁদরেল। তিনি বারান্দায় উঠেই, সকলের মুখের দিকে একবার দেখে নিয়ে, খোকনের দিকে তাকালেন। বোধ হয় খোকনের চেহারাটাই সব থেকে লম্বা-চওড়া বলে, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বেশ কর্তা-ব্যক্তির মত জিজ্ঞেস করলেন, 'চন্দ্রকান্ত হালদার কে?'

'চন্দ্রকান্ত হালদার বলে কেউ নেই।' খোকন বলল, 'চন্দ্রনাথ হালদার আছে।'

ভদ্রলোক বিরক্ত গম্ভীর মুখে বললেন, 'ওই হল। যাকে বলে শ্রীকান্ত, তাকেই বলে শ্রীনাথ।'

'যাকে বলে অলাবু, তাকেই বলে লাউ।' নিমাই বলল, 'আপনার নামটা কিন্তু এখনো জানা হল না।'

ভদ্রলোক নিমাইয়ের দিকে ফিরে প্রায় ঘোঁৎ করে উঠলেন, 'তার

মানে ?'

'আপনার নামটা জানতে চাইছিলাম।' নিমাই বলল।

ভদ্রলোক আগের মতই রুখে বললেন, 'কিন্তু ওই লাউ-ফাউ কী সব বলা হচ্ছিল ?'

'ফাউ বলি নি।' নিমাই বিনীত ভাবে বলল, 'আপনি বলছিলেন না, শ্রীকান্ত আর শ্রীনাথ এক কথা। আমিও তাই বলছিলাম, অলাবু আর লাউ এক কথা। অলাবু মানে তো লাউ, তাই না ?'

ভদ্রলোকের গোলগাল বড় মুখখানি থমথমিয়ে উঠল, বললেন, 'তা হতে পারে, আমি ওসব লাউ-টাউয়ের কথা জানি না।'

'তার দরকারই বা কী, আপনি বসুন না।' খোকন চেয়ার দেখিয়ে বলল।

ভদ্রলোক বসে বললেন, 'বসবার দরকারই বা কী ? কানপাশার খবর দেখে এসেছি, দেখে চলে যাব।'

চাঁদ এতক্ষণে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম কী, কোথা থেকে আসছেন, জানতে পারি ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন জানতে পারবেন না ? আমার নাম রাধাশ্যাম নস্কর, দোগেছে থেকে আসছি। আপনাদের মধ্যে চন্দ্রকান্ত হালদার কে ?'

চাঁদ বলল, 'আপনার দেখছি একটু কান্ত ভাব বেশি। আমার নাম চন্দ্রনাথ হালদার। এবার বলুন, আপনার কী বলবার আছে ?'

রাধাশ্যাম নস্কর বললেন, 'আপনি একটা কানপাশা পেয়েছেন বলে, দেওয়ালে নোটিস দিয়েছেন ?'

চাঁদ কিছুটা নির্বিকারভাবে বলল, 'কে বলল আপনাকে ?'

'বলবে মানে ?' রাধাশ্যাম রীতিমত ঝাঁজালো স্বরে, ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বললেন, 'বলবে আবার কে, আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

চাঁদ ঠোঁট টিপে হেসে, বন্ধুদের সঙ্গে একবার দৃষ্টি-বিনিময় করে বলল, 'তাই নাকি ? তবে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন ? এখন আপনার

যা বলবার আছে, তা চটপট বলে ফেলুন তো রাধানাথবাবু।'

'রাধানাথ মানে ? আমার নাম রাধাশ্যাম নস্কর।' তাঁর কাঁধে কয়েকটি ভাঁজ পড়ল।

চাঁদ হেসে বলল, 'তা আপনার রাধার শ্যামও যে, নাথও সে, একই কথা হল, তাই না ?'

নিমাই হেসে উঠে বলল, 'বেশ বলেছিস গুরু!'

'কী, আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা হচ্ছে ?' রাধাশ্যাম নস্কর গর্জিত স্বরে হুমকিয়ে উঠলেন।

যতীন তাড়াতাড়ি বলল, 'এই নিমাই, কী সব আজে-বাজে কথা বলছিস! ভদ্রলোকের মান রাখতে জানিস না ?' বলে, রাধাশ্যামের দিকে ফিরে বলল, 'কিছু মনে করবেন না নস্করমশাই, এ ভারি ছেলেমানুষ। তবে আপনি ওই শ্যাম আর নাথ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, ওরকম ভুল-চুক আপনার আমাদের, সকলেরই হতে পারে। এখন মোদ্দা কথাটা যদি বলতেন, ভাল হত।'

'মোদ্দা কথা কানপাশা।' রাধাশ্যাম টেবিলের ওপর একটি চাপড় মেরে বললেন, 'সে-কথা বলব বলেই তো এসেছি। কিন্তু আমার সঙ্গে ফচ্‌কেমি করলে, তার ফল খুব ভাল হবে না।'

খোকন এবার গম্ভীর মুখে বলল, 'ফচ্‌কেমি আপনার সঙ্গে কেউ করে নি। আপনিই প্রথম থেকে খুব গ্যাস নিয়ে কথা বলছেন। আমাদের বন্ধুর নাম ভুল করে বলেও বলছেন, ঠিকই বলেছেন। আপনি যদি ঠিক বলে থাকেন, আমরাও ঠিক বলেছি। তবে শাসাবেন না। আপনার শাসানি শোনার জন্যে আমরা এখানে বসে নেই। কানপাশা নিয়ে আপনার কী বলবার আছে বলুন। আপনার কানপাশা হারিয়েছে ?'

রাধাশ্যাম নস্করের স্ফীত ফরসা মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটে উঠল, যার ফলে তাঁর চোখজোড়া প্রায় ঢেকে গেল। বললেন, 'আমার কানপাশা ? ব্যাটাছেলে আবার কানপাশা পরে নাকি ?' বলে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র দুই কানে হাত দিলেন।

'আপনার কানপাশা মানে, আপনার কানে পরার কথা বলা হচ্ছে না।' খোকন এবার কিঞ্চিৎ ঝাঁজালো স্বরে বলল, ওর চওড়া বুকটা একটু উঁচু হয়ে উঠল, 'আপনার মাথায় কত ওজনের বুদ্ধি আছে, তা আপনিই জানেন। আপনি কানে কানপাশা পরলে, চেহারাটা কী দাঁড়াত, বুঝতে পারছেন?'

শম্ভু বলে উঠল, 'হরিবল।'

রাধাশ্যাম নস্কর বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না, বরং অর্ধচন্দ্রাকারে হাসিটি আরো বিস্তৃত হল। বললেন, 'আরে ভাই, আমিও তো সেই কথাই বলছি। আপনি দেখছি খুব সীরিয়াস মাইণ্ডেড লোক, আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে—ইয়ে—মানে. আপনার নাম কী ভাই?'

'খোকন।' শম্ভু বলল।

রাধাশ্যাম চোখ বড় করে বললেন, 'খোকন? ছেলেবেলায় ভাই একটা বই পড়েছিলাম, এক পুলিস সাহেবের লেখা, তাতে খোকা গুণ্ডার কথা পড়েছি। সাংঘাতিক খুনী!'

চাঁদ ভুরু কুঁচকে বলল, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমার বন্ধু খুনী?'

রাধাশ্যাম তাঁর মস্ত বড় আর মোটা জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, তা কখনো বলতে পারি? খোকনবাবুর চেহারাটা খুব ইয়ে—মানে ব্যায়াম-বীরের মত। খোকনবাবু আপনার গুরু কে ভাই?'

'কিসের গুরু?' খোকন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

রাধাশ্যাম হাত বাড়িয়ে খোকনের চওড়া শক্ত বাইসেপে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'এর গুরু। গুরুর কাছে শিক্ষা না নিলে, এরকম শরীর তৈরী করা যায় না।'

'আমার কোন গুরু-টুরু নেই মশাই।' খোকন একটু সরে গিয়ে বলল, 'বড্ড জ্বালাচ্ছেন। এখন কানপাশার কথা কী বলতে এসেছেন, তাই বলুন।'

রাধাশ্যামের সেই রাশভারি জাঁদরেল ভাব আর নেই। বললেন,

'নিশ্চয় নিশ্চয়, সে-কথা বলতেই তো এসেছি। আমি আবার একটু আইন-মাফিক কথা বলি। কোন দিকে ফাঁক পাবেন না। সেই জন্যই চন্দ্রকান্ত, থুড়ি, চন্দ্রনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করছিলাম, হাতে লিখে, কান-পাশার নোটিসটা তিনিই লাগিয়েছেন কী না? এসব জিজ্ঞেস করা উচিত, বুঝলেন না? উনি যদি বলে বসেন, না উনি নোটিস ঝোলান নি, তা হলে?'

'তাহলে কচু।' যতীনের মত শান্ত মানুষও এবার একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, 'ওসব আইন-টাইনের কথা ছাড়ুন। নোটিসে স্পষ্ট লেখা ছিল, পাওয়া গিয়াছে। তার সঙ্গে চন্দ্রনাথ হালদারের সইও ছিল, ঠিকানাও লেখা ছিল। আপনি তো সেই ঠিকানা পড়েই এসেছেন, না কী?'

রাধাশ্যাম বললেন, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই। তবু ভাই একবার কাঁড়িয়ে নেওয়া দরকার। যাই হোক, কিন্তু কোথায় পাওয়া গেছে, সেকথা তো লেখা ছিল না?'

চাঁদ এবং ওর চার বন্ধুকেই প্রথমে কিছুটা হতভম্ব দেখাল। যতীন বলল, 'তার মানে?'

'তার মানে—' রাধাশ্যাম বললেন, 'কানপাশাটা কোথায় পাওয়া গেছে, সেকথা তো লেখা ছিল না?'

চাঁদ এক মুহূর্ত রাধাশ্যামের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করল, তারপর বলল, 'আইনে বুঝি বলে, সেটাও নোটিসে লিখতে হবে? আপনি কি মশাই, যা কথায় বলে, বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন? তা সে-যুগও আর নেই, এ দেশে বাঙাল বলেও আর কেউ নেই। এবার সোজা কথায় আসুন, আপনার কার কানপাশা হারিয়েছে?'

খোকন এগিয়ে এসে বলে উঠল, 'এ-সব কথা বলাবলির আর দরকার নেই, অনেক আয়ু ক্ষয় হয়েছে। নিন রাধানাথবাবু, এবার উঠুন তো, আমাদের অনেক কাজ আছে।'

রাধাশ্যামের চোখে-মুখে ভীতির ভাব দেখা দিল, তিনি একবার খোকনের চওড়া বুক আর কাঁধের দিকে দেখলেন। বললেন, 'কিন্তু

আমার শালীর কানপাশা যে হারিয়েছে!'

'কোথায় সে কানপাশা?' চাঁদও এক-পা এগিয়ে এসে বলল, 'জোড়ার আর একটা প্রমাণ-হিসাবে এনেছেন? বের করুন, সেটা দেখি।'

রাধাশ্যাম ঘাড়ে-গর্দানে ভাঁজ ফেলে, লোমশ ভুরু কুঁচকে অবাক স্বরে বললেন, 'সেটা কেন দেখাব? আগে আপনারটা দেখান, দেখি আমারটার সঙ্গে মিল আছে কী না।'

'ইয়ার্কি পেয়েছেন?' চাঁদ বলল, 'আমারটা আগে আপনাকে দেখাব?'

রাধাশ্যাম এবার ফুঁসে উঠলেন, 'কী, আমি ইয়ার্কি করছি? আমি আপনার ইয়ার?'

'না, আপনি ওর জ্যাঠামশাই, হল তো?' খোকন হাতের ভঙ্গি করে বলল, 'নিন নিন, উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি। চলুন আপনাকে রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

রাধাশ্যামের মুখে তৎক্ষণাৎ আবার বিগলিত হাসি দেখা দিল, বললেন, 'কী যে বলেন খোকনবাবু, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। খালি কান-পাশাটা—'

'তুত্তোরি তোর নিকুচি করেছে কানপাশার!' খোকন হাত বাড়াতে উদ্যত হয়ে বলল।

এই সময়েই মালা একটা ভাঙা এলুমিনিয়ামের কড়ায়, দুধ-রুটির টুকরো ভেজানো নিয়ে, জিভ দিয়ে তু তু শব্দ করে এগিয়ে এল। কড়াটা রাখতে না রাখতেই, একপাল কুকুরের বাচ্চা দৌড়ে লাফিয়ে ছুটে এল। সঙ্গে তাদের ধাড়ি মা। রাধাশ্যাম ওঁর বিশাল শরীর নিয়ে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এ-সব আবার কী, অ্যাঁ? আমি কুকুর-টুকুর একদম দেখতে পারি না।'

রাধাশ্যামের আচরণে, ধাড়ি কুকুরটা বিরক্ত আর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। তাঁর দিকে তাকিয়ে গোঁ গোঁ করে শব্দ করল। রাধাশ্যামের চোখে আতঙ্ক

ফুটল। তিনি এক-পা এক-পা করে বারান্দার সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে চিৎকার করে বললেন, 'আমাকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ?'

ধাড়ি কুকুরটা রাধাশ্যামের আচরণে আরো রেগে উঠে, তেড়ে ওঠবার ভঙ্গি করে, ঘেউ ঘেউ করে উঠল। যতীন তখন হাসতে আরম্ভ করেছে। ওর দেখাদেখি নিমাই আর শম্ভুও। রাধাশ্যামের আচরণে, কুকুরটা রীতিমত ডাকতে আরম্ভ করল। তিনি সিঁড়িতে পা দেবা মাত্র, কুকুরটা সত্যি তেড়ে গেল। রাধাশ্যাম লাফ দিয়ে নিচে পড়লেন। কুকুরটাও লাফ দেবার উপক্রম করতেই, চাঁদ ডেকে উঠল, 'এই বুলি, বুলি এদিকে আয়।'

ধাড়ি বুলি চকিতে একবার চাঁদ আর তার বাচ্ছাদের দেখে নিয়ে, বারান্দা থেকেই ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। রাধাশ্যাম নস্কর তখন গেটের কাছ থেকে চিৎকার করছেন, 'আমাব নাম রাধাশ্যাম নস্কর, এই বলে দিয়ে গেলাম। শালীর কানপাশা আমি আদায় করবই। এখুনি আমি থানায় যাচ্ছি। গুণ্ডা আর কুকুর লেলিয়ে দিয়ে—'

চাঁদ তৎক্ষণাৎ জিভ দিয়ে শব্দ করল, 'বুলি, স্ স্ স্…।'

বুলি তৎক্ষণাৎ বারান্দার নিচে ঝাঁপ দিল। রাধাশ্যাম গেটের বাইরে গিয়ে, ছুট লাগালেন। পাঁচ বন্ধু তখন প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ছে। শম্ভু বলল, 'শালা পাক্কা বাটপাড় লোকটা। ফেরেববাজের মত যা খুশি তাই বলছিল।'

চাঁদ একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'কিন্তু আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যেতে বসেছে। এই সব মাল যদি ক্রমাগত আসতে থাকে, তা হলেই হয়েছে।' ও কথা শেষ করেই, ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে মালার দিকে তাকাল।

মালা তখন মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে হাসছে। চাঁদ জিজ্ঞেস করল, 'এই মালা, কুকুরের বাচ্ছাগুলোকে তোকে এখানে এনে কে খেতে দিতে বলল ? লেবুগাছের তলায় দিস নি কেন ?'

মালা বলল, 'বউদিই তো আমাকে এখানে দিতে বলল।'

চাঁদ অবাক চোখে বন্ধুদের দিকে তাকাল। বন্ধুরাও তাকিয়েছিল। তারপরে চাঁদ ছাড়া, সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। খোকন চিৎকার করে বলল, 'বউদি, জিন্দাবাদ ! বউদির জবাব নেই।'

চাঁদ ছাড়া সবাই সমস্বরে খোকনের কথার প্রতিধ্বনি করল। চিৎকার শুনেই যেন পরী দরজার কাছে এসে বলল, 'কী হল, বউদি আবার কী করল ?'

যতীন গিয়ে তাড়াতাড়ি পরীর পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'সত্যি বউদি, আপনার জবাব নেই।'

শম্ভু বলল, 'ওই হোঁৎকা খচ্চরটাকে— !'

'ল্যাংগোয়েজ প্লিজ !' যতীন বাধা দিয়ে বলল, 'বউদির সামনে একদম আজে-বাজে কথা বলা চলবে না।'

খোকন বলল, 'বউদি, আপনার মাথায় এ বুদ্ধিটা না এলে, লোক-টাকে ঘাড়ধাক্কা খেতে হত।'

পরী তার লাল ঠোঁট দুটি টিপে, অবাক নিরীহ স্বরে বলল, 'ওমা, আমার আবার কী বুদ্ধি দেখলে তোমরা ? ঘাড়-ধাক্কাই বা কে খেত ?'

যতীন বলল, 'আপনি যদি মালাকে দিয়ে কুকুরবাচ্ছাগুলোকে এখানে খেতে না পাঠাতেন, তা হলে বদ্‌খদ্ লোকটা কখনোই পালাত না।'

পরী নির্বিকার স্বরে বলল, 'কে তোমাদের বদ্‌খদ্ লোক, আমি দেখিও নি। লেবুগাছের তলায় খুব রোদ এসে পড়েছে, তাই মালাকে বললাম, এখানে বারান্দায় এনে খেতে দিতে। আমি তো আর কিছুই জানি না।'

পরী চোখের কোণে একবার চাঁদের দিকে দেখে, ভিতরে চলে গেল। সবাই তাকাল চাঁদের দিকে। চাঁদ বিভ্রান্ত ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

যতীন বলল, 'কিছু বুঝতে হবে না। খালি মনে মনে বল্, বউদি তোমাকে শতকোটি প্রণাম ! বোঝবার চেষ্টা করিস না।' বলে ও কপালে

জু হাত ঠেকাল।

চাঁদ বাদে, সবাই কপালে জোড়হাত ঠেকাল। খোকন বলল, 'যা বলেছিস! তা না হলে লোকটাকে মেরে ভাগাতে হত।'

'আর তা হলেই কেচ্ছা জমত।' যতীন বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, রাধাশ্যাম নস্কর লোকটা মতলববাজ। তা নইলে কেউ হারানো জিনিস খুঁজতে এসে, প্রমাণ না দিয়ে, পাল্টা চোখ রাঙাত না। মার খেলে, ঠিক থানায় যেত, আমরা পড়ে যেতাম ফ্যাসাদে।'

চাঁদ বলল, 'ফ্যাসাদের আর বাকীটা কোথায় আছে, তা তো বুঝতে পারছি না।'

'কেন, এখন আর ফ্যাসাদ কিসের?' খোকন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

চাঁদ রুক্ষ স্বরে বলল, 'ফ্যাসাদ না? এই সব রাধাশ্যাম নস্করের মত মালেরা আসবে, আর মাথা খারাপ করার মত কথা বলবে, এতে কখনো মাথার ঠিক থাকে? সকাল থেকে যা সব আসছে, একে ফ্যাসাদ ছাড়া কী বলব, শুনি?'

শম্ভু বলে উঠল, 'ওই জন্যেই বলেছিলাম দোস্ত, এ হল উৎপাতের ধন, চিৎপাতে দেওয়াই ভাল। তখন আমার কথা শুনলি না।'

'না, তোমার কথা শোনা হবে না।' যতীন মুখবিকৃত করে খেঁকিয়ে বলল, 'আমরা কারোর পকেট মারি নি যে উৎপাতের ধন হবে।'

নিমাই বলল, 'তা বলে এসব ফালতু মালের উৎপাত সইতে হবে?'

খোকন বলল, 'তা তো সইতেই হবে, কিন্তু পরের জিনিস পেয়েছি বলে, সেটা মেরে দিতে হবে নাকি? ওসব ইতরামো আমরা করতে পাবব না। যা করেছি, নিজেরা আলোচনা করে করেছি।'

'এটা হচ্ছে একটা একস্‌পিরিয়েন্স। যতীন বলল, 'কত ঠগ্-জোচ্চোরের দেখা পাওয়া যাবে, আবার কত ভাল মানুষের। যেমন বুড়ি ঠাকুমাটি এসেছিল। নাতনীর বিয়ের ঘটকালিও করে গেল।'

যতীনের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। খোকন পকেট থেকে

সিগারেটের প্যাকেট বের করে, সবাইকে একটা করে দিয়ে বলল, 'সবাই মিলে একটু নেশা করে নেওয়া যাক।'

চাঁদের মুখ চিন্তিত এবং গম্ভীর। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এসব না হয় মেনে নিচ্ছি, কিন্তু বউদির ভাব-সাব আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বউদির ভাব-সাব না বোঝার কারণ কী?' যতীন বলল, 'বউদি ইজ হেল্‌পিং আস্‌।'

চাঁদের চিন্তা এ কথায় দূর হল না। বলল, 'চান করতে ঢুকলাম বউদিকে এক রকম দেখে, বেরিয়ে দেখছি আর এক রকম। দাদা বউদি দুজনে ঝগড়া করছিল, বুঝতেই পারছি দাদা রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেছে। অথচ এখন বউদি হাসিখুশি।'

খোকন বলল, 'তা তো হবেই, বউদি যে এখন আমাদের দলে এসে গেছে। এখন তোর দাদা এলেও দেখবি, দুজনের ভাব হয়ে গেছে। না হয় একটু পরে আমরাই দাদাকে খুঁজে নিয়ে আসব।'

খোকনের কথা শেষ হবার আগেই, চাঁদের দৃষ্টি গেল গেটের কাছে। ভুরু কুঁচকে দেখল, রজকিনী গোলাপীর দুই তরুণী নাতনী সেখানে দাঁড়িয়ে। কাছেই একটা পুকুরে ওরা কাপড় কাচে। সপ্তাহে তিন দিন ভাঁটি হয়। পুকুরের মালিক সেনবংশের কোন এক পুরুষ গোলাপীর যৌবনে, তার প্রেমে পড়েছিলেন। সেই সূত্রে পুকুরটি এবং আশপাশের কিছু জমি সে পেয়েছিল। অবিশ্যি, সেন বংশের অধস্তন পুরুষরা তা সহজে কবুল করতে বা ছাড়তে চায় নি। কোর্ট অবধি মামলা গড়িয়েছিল।

গোলাপীও লড়েছিল, লড়েই জিতেছিল। তার প্রেমের স্বত্ব খোয়া যায় নি।

গোলাপী রজকিনীর কন্যা এবং পুত্রবধূদের নিয়েও, অনেক সদবংশ-জাত যুবকদের মাথাব্যথা ছিল। এখন নাতনীদের নিয়েও, উঠতি থেকে পড়তি বয়সের পুরুষদের বেজায় মাথাব্যথা। ছুটির দিনে ভাঁটি হলে, পুকুরপাড়ে তরুণদের রীতিমত ভিড়। না হওয়ার অবিশ্যি কোন কারণও নেই। গোলাপীর ঘরের সব মেয়েদেরই, রূপের কিছু চটক আর ছটা বরাবর ছিল, আছেও। তাদের আচরণ স্বৈরিণী-সুলভ নয় বটে, কিন্তু হাসি-মস্করায় কিছুটা বেপরোয়া। ওরা কাপড় কাচতে গিয়ে নাচে না, অথচ নাচের একটা ছন্দ আছে ওদের শরীরে।

চাঁদ জানে, শাক্ত মতে রজকিনী একটি শক্তি। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের যেমন ডোম্বিনী। স্বয়ং চণ্ডীদাস রচনা করেছিলেন বৈষ্ণব পদাবলী, কিন্তু তিনি ছিলেন অতি ভয়ঙ্করী বিশালাক্ষী—বাশুলি দেবীর পূজারী। তাঁরও ছিল, 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম' যদিও 'কামগন্ধ নাহি তাহে'। সত্যি কথা বলতে কি, গোলাপীর নাতনীদের দিকে তাকিয়ে, চাঁদের বুকেও, কয়েক বার অলখ্ টানের জোয়ার উঠেছে। তবে তা নিতান্তই তাৎক্ষণিক, একটা বয়সোচিত প্রকৃতির ঝংকার। মনে করে রাখবার মত কিছু না। কিন্তু এ মেয়ে দুটো এ বাড়ির দরজায় কেন?

চাঁদের মনে জিজ্ঞাসা জেগে ওঠা মাত্রই, নিমাই বিস্মিত আহ্লাদে হেসে উঠে বলল, 'আরে, গোলাপীদির নাতনী, ঠুমি আর ঝুমি এসেছে দেখছি।'

'সত্যিই তো মাইরি।' শম্ভুর চোখ দুটিও ঝিলিক দিয়ে উঠল, গলার স্বরে বিস্মিত খুশি।

যতীন মুখ গোমড়া করে বলল, 'তবে আর কী, যাও, হাত ধরে নিয়ে এসো।'

নিমাই দু-পা এগিয়ে বলল, 'হাত ধরার কী আছে, এমনিই ডাকছি। ব্যাপারটা কী শুনি।' বলেই ডাকল, 'কী, তোমরা কী জন্য? এসো

এখানে।'

খোকন নিমাইয়ের মাথায় ঠাস্ করে একটা গাট্টা মারল, দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'শালা! একেবারে গলে গেল। এখানে ডাকবার দরকার কী? নিজে যেতে পারিস না?'

যতীন রুষ্ট স্বরে বলল, 'ছুঁড়ি দুটো আবার পাছাপেড়ে শাড়ি, নাইয়ের নিচে পরেছে। যত সব ঢলানী।'

নিমাই রেগে উঠে খোকনকে বলল, 'মারলি যে?'

'তুই ডাকতে গেলি কেন?' খোকন বলল।

ঠুমি আর ঝুমি তখন গেট খুলে ভিতরে ঢুকে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। নিমাই ঝেঁজে বলল, 'ডাকব আবার কী? ওরা নিজেরাই তো এসেছে। আমি ওদের এখানে ডেকে এনেছি?'

শম্ভুও রেগে বলল, 'ছাখ্, খোকন, তুই ওসব রুস্তমি দেখাস নে বলে দিচ্ছি। তুমি শালা একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা, না? বিয়ে করে জাতে উঠে গেছিস?'

চাঁদ এবার বেশ খুশি-খুশি স্বরে বলে উঠল, 'কী, ঠুমি ঝুমি, তোমরা কী মনে করে? বউদি কাপড়-চোপড় কাচতে দিয়েছিল নাকি?'

খোকন আর যতীন, চাঁদের হাসিমুখ দেখে, নিজেদের মধ্যে অবাক আর বিরক্ত দৃষ্টি বিনিময় করল।

ঠুমি ঝুমি, দুজনেরই, পাছাপাড় শাড়ির আঁচল গাছকোমর করে বাঁধা। বিনুনিহীন চুলের গোছা, টেনে ঘাড়ের কাছে জড়ানো। হাতে কোন চুড়ি-বালা নেই, কাজের সময় থাকেও না। গলায় রূপোর হার দুজনের কাপড়েই নিচের অংশ জলে ভেজা। বোঝা যায়, কাজ করতে করতে চলে এসেছে। রূপে ওরা কেউ তিলোত্তমা নয় বটে, কিন্তু ওদের ডাগর চোখের কালো তারার ঝিলিকে জাদু আছে, মুখের সৌষ্ঠবে শ্রী স্বাস্থ্যে লাবণ্য আর দৃঢ়তা সমান বর্তমান। যার নাম ঠুমি, সে হেসে বলল 'না, কাপড়চোপড় না, তুমি নাকি সোনার মাকড়ি কুড়িয়ে পেয়েছ?'

চাঁদ অবাক হয়ে বলল, 'সোনার মাকড়ি?'

নিমাই বলে উঠল, 'আরে ওই হল, মাকড়ি আর কানপাশা একই থা।'

শম্ভু বলল, 'তোমরা নিচে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ওপরে উঠে এস না।'

ঠুমি আর ঝুমি লজ্জিত হেসে, প্রায় নাচের ছন্দে ওপরে উঠে এল। মি বলল, 'আমার একটা সোনার মাকড়ি হারিয়েছে।'

চাঁদ জিজ্ঞেস করল, 'মাকড়িটা কী জিনিস?'

নিমাই জবাব দিল, 'আরে মাকড়ি জানিস না? কানের মাকড়ি। নেকটা মাকড়ের মত দেখতে বলে, কানের ওগুলোকে মাকড়ি বলে।'

'হ্যাঁ, মাকড়ি, মানে মাকড়কে যারা গিলে খায়।' যতীন ঠোঁট াকিয়ে, উত্তপ্ত স্বরে বলল।

খোকন সায় দিয়ে বলল, 'আর মাকড়গুলো তাতেই মরে।'

ঠুমি আর ঝুমি খিল খিল করে হেসে উঠল। ঠুমি বলল, 'হ্যাঁ গো ত্যি, পুরুষ মাকড়গুলোকে মাকড়িরা খেয়ে ফ্যালে, আর তাইতেই াকড়িরা পোয়াতি হয়।'

ঝুমি ঠুমির গায়ে একটা চাঁটি মেরে বলল, 'হট্, কী সব বলছিস ই।'

চাঁদ হেসে বলল, 'কথাটা কিন্তু সত্যি।'

নিমাই প্রায় ঠুমির গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বলল, 'ঠুমি ওসব ল বলে না। কিন্তু মাকড়দের মরেই সুখ, তাই না?'

ঠুমি ঝুমি আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। ওদের হাসির লহরে রীর দোলা দেখে, পাঁচ বন্ধুই কেমন অবাক মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। মন কি খোকন আর যতীনও। চাঁদ জিজ্ঞেস করল ঝুমিকে, 'মাকড়িটা কমন করে হারালে? কোথায় হারালে?'

ঝুমি ওর শূন্য কানে একবার স্পর্শ করে বলল, 'কী জানি কোথায় ারিয়েছি। ভাঁটিতে এসে পুকুরধারে হারাতে পারে। কতবার তো দিক-ওদিক যাই, রাস্তা-ঘাটে কোথায় খুলে পড়ে গেছে, কে জানে?'

ঠুমি বলল, 'তিন মাস হয়ে গেল, এখনো ঝুমি মাকড়ির জন্য রোজ

রাতে কাঁদে।'

'আর মা আর দাদী যে রোজ খোঁটা দেয়, কত কী বলে?' ঝুমি ঠোঁট ফুলিয়ে বলল।

নিমাই বলল, 'একটা সোনার মাকড়ির জন্য? আমাকে বললেই পারতে?'

নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে ঠুমি আর ঝুমি চোখে চোখে তাকালো। ঠুমি বলল, 'তারই বা কী দরকার? নিজেরটা পেলেই হল।'

শম্ভু ঠুমির গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর আমরা দিলে নিতে পারবে না বুঝি?'

ঝুমি চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'সে তোমার মন চাইলে দেবে, নেব না কেন?'

'মনের নিকুচি করেছে।' পরী ঝঙ্কার দিয়ে দরজায় আবির্ভূত হল, বলল, 'ছুঁড়িরা ন্যাকামো না করে, তোদের মাকড়িফাকড়ি কী হারিয়েছে, তাই আগে দেখা না। জোড়ার একটা এনেছিস?'

মুহূর্তে আবহাওয়া ঘুরে গেল। ঠুমি ঝুমির হাসি অন্তর্হিত। রসিকদের সকলের মুখেই অস্বস্তির আড়ষ্টতা। ঠুমি তাড়াতাড়ি বুকের জামায় হাত ঢুকিয়ে, ত্রস্ত স্বরে বলল, 'এনেছি।'

'তবে সেইটিই দেখাও।' পরী ঝামটা দিয়ে উঠল, 'অত মন চাওয়া জিনিসের দরকার কী?'

ঠুমি বুকের ভিতর থেকে বের করল একটি কাগজের মোড়ক। সেটি খুলে দেখাল, একটি অতি সাধারণ হালকা সোনার পাতের ছোট মাকড়পাশা। পরী কিছু বলতে গিয়েও, থেমে গেল, চাঁদের দিকে ফিরে বলল, 'নাও ছ্যাখো, তোমার পাওয়া কানপাশার জোড়া কি এটা?'

চাঁদ বিরস মুখে ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'মোটেই না। সে জিনিস আর এ জিনিস একদম আলাদা।'

'হল তো?' পরী বলল ঠুমি আর ঝুমির দিকে তাকিয়ে, 'এবার বিদেয় হ' দেখি?'

ঠুমি আর ঝুমি কোন দিকে না তাকিয়ে, বারান্দা থেকে নেমে, গেট
়লে চলে গেল। পরী সেদিকে চোখ রেখেই চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,
াকড়ি খুজতে এসে মাকড় ধরার ফিকির! ঝাঁটা মেরে বিদেয় করা
চিত।'

বলেই, দীপ্ত বিদ্রূপের চোখে সকলের দিকে একবার দেখে, হনহনিয়ে
ꠕতরে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত কারোর মুখে কথা ফুটলো না। যতীন
াৎ হেসে উঠে বলল, 'সত্যি, বউদির জবাব নেই। মাকড়গুলোকে ঠিক
নতে পেরেছে। একে বলে ভূতের ওঝা।'

নিমাই এবার নাকের পাটা ফুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বউদি সব মাকড়-
রেই চিনতে পেরেছে। তার থেকে তুইও বাকী নেই। চোখ দিয়ে তো
দের গিলছিলি।'

যতীন রাগ করল না, আরো জোরে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তা তো
টই! কিন্তু আমি তো আর গোলাপীর নাতনীদের সোনার মাকড়ি
ড়িয়ে দিতে চাই নি?'

খোকন যতীনের সঙ্গে হেসে উঠে বলল, 'আবার কী সোহাগ
ইরি! মন চাইলে যদি কেউ দেয়, তবে কেন নেবে না?'

'আর বউদি একেবারে বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে।' যতীন বলে হো
া করে হেসে উঠল।

শম্ভু চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, 'ছাখ যতীন, তুই ভাবিস, ডুবে ডুবে
ল খাস, শিবের বাবাও টের পায় না। ঠিক আছে, আমি গিয়ে তৃপ্তিকে
ব বলে আসব!'

তৃপ্তি যতীনের বউয়ের নাম। যতীন ভুরু কুঁচকে বলল, 'তৃপ্তিকে
বার তুই কী বলবি?'

শম্ভু গম্ভীর মুখে, একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'বলব, বছর খানেক
গের একটা ঘটনা বলব।'

যতীন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু চোখে, সকলের দিকে তাকালো। খোকন
ল, 'এই ছাখ্ শম্ভে, মেয়েদের মত করিস না। ঝেড়ে কাশ, যা বলবি,

সোজাসুজি বলবি।'

'কেন সোজাসুজি বলব?' শম্ভু বলল, 'তোরা কি সোজাসুজি স
বলছিস? আমি তো না হয় খুব খারাপ, ঠাট্টা করে সোনার মাকড়ি দে
বলেছি। আর কেউ কেউ যে গোলাপী বুড়িকে ডালপুরি খাওয়ার জ
নগদ একটা টাকা দেয়?'

সবাই যতীনের দিকে তাকাল। যতীনের চোখে অন্যমনস্কতা, তা
পরেই একটু ঝিলিক দিয়ে উঠল।

খুবই তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, 'ওহ্, সেই কোন্ কালের কথা, খা
ফেলে দে। বুড়ি মানুষ, শীতের সকালে ডালপুরি খেতে চেয়েছিল, তা
একটা টাকা দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, কেবল এক শীতের সকালেই দিয়েছিলি!' শম্ভু বলল, 'বর্ষা
দিনে কে-ই বা আর আড়ি পেতে দেখতে যাচ্ছে?'

চাঁদ আর নিমাই হেসে উঠল। যতীন রেগে ঝাঁজিয়ে উঠে বল
'দ্যাখ্, শম্ভু, খচরামি করিস না। কী বলতে চাস তুই? আমি
রেগুলার গোলাপী বুড়িকে ডালপুরি খাওয়াতাম?'

শম্ভু বলল, 'তা কি আমি বলেছি? আর তুই তো শুধু গোলা
বুড়িকেই খাইয়েছিলি, তার নাতনীদের দিকে তো তোর একটুও ন
ছিল না।'

চাঁদ আর নিমাইয়ের সঙ্গে এবার খোকনও হেসে উঠল। যত
বিরক্ত ক্রুদ্ধ মুখে সকলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ দেখল, তারপ
ভেংচিয়ে উঠে বলল, 'হো হো হো, এখন সবাই যতীনের পেছনে ক
দিতে এসেছ, বড় মজা! মুখ যদি খুলি তো··'

'কই হে চাঁদ, বাড়ি আছ নাকি?' গেটের কাছ থেকে গম্ভীর
শোনা গেল।

চাঁদ গেটের দিকে তাকিয়ে, তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে বলল, 'এই
ইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার পতিতপাবনবাবু এসেছেন দেখছি।

পাঁচ বন্ধুই বেশ সটান আর বিনীত হয়ে উঠল। টেবিলের ও

থকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই পকেটে ঢুকিয়ে দিল। খোকন নিচু স্বরে বলল, 'বুড়ো হঠাৎ কী মনে করে?'

যতীন বলল, 'পতিতপাবনবাবু আমাকে কয়েকদিন আগে, ওঁর মেয়ের জন্য একটা ছেলে দেখতে বলেছিলেন।'

চাঁদ ইতিমধ্যে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আসুন স্যার।'

'এই যে তুমি আছ?' পতিতপাবনবাবু তাঁর মস্ত ভুঁড়ি দিয়ে গেটে চাপ দিয়ে, ভিতরে ঢুকে এলেন। মাথায় তাঁর মস্ত টাক। টাক আর ভুঁড়িতেই তিনি এই শহরের সকলের চোখে বিশিষ্ট। হাতে মোটা ছড়ি, চোখে মোটা লেন্সের চশমা। চোখের দৃষ্টি চকিত আর সতর্ক। শহরে তাঁর বরাবরের একটি দুর্নাম, ইস্কুলের বড়লোকের ছেলেদের তিনি বিশেষ সুনজরে দেখতেন। বড়লোকের ছেলেদের তিনি প্রাইভেট পড়াতেন। তাঁর ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা থাকত উজ্জ্বল আর অকলঙ্কিত। এখন তিনি রিটায়ার করেছেন, অতএব সে সব অতীত কাহিনী।

চাঁদ এবং ওর চার বন্ধু, সকলেই পতিতপাবনবাবুর ছাত্র। সকলেই শশব্যস্ত ভাবে সমীহ করে সরে দাঁড়াল। পতিতপাবনবাবু লাঠিতে ভর দিয়ে গলা দিয়ে নানা রকম শব্দ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন। রীতিমত ঘেমে উঠেছেন। বললেন, 'এ শরীরে কি আর এ সব পোষায়? আজকাল আর একটুও হাঁটাহাঁটি করতে পারি না।'

চাঁদ তাড়াতাড়ি একটা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন স্যার।'

সকলেই জানে, পতিতপাবনবাবু এখনো হেঁটে হেঁটে বাজার করা থেকে কয়লার দোকান, গোয়ালার বাড়ি পর্যন্ত যাতায়াত করেন। ভুলেও কখনো রিক্সায় চাপেন না। হয়তো তাঁর শরীরের জন্য হাঁটাই প্রয়োজন, কিন্তু লোকে বলে তিনি অতি কৃপণ।

পতিতপাবনবাবু সকলের দিকে একবার দেখে বললেন, 'ওহ্, তোমরাও সব আছ দেখছি, বেশ বেশ। শশী কোথায়?'

চাঁদের দাদার নাম শশীনাথ, সে-ও পতিতপাবনবাবুরই ছাত্র। চাঁদ

বলল, 'দাদা একটু বেরিয়েছে। দাদার সঙ্গে দরকার ছিল নাকি স্যার
পতিতপাবনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না না, দরকার আমা
তোমার সঙ্গেই। শশীর সঙ্গেও দরকার আছে, কাল মিউনিসিপা
অফিসে গিয়ে দেখা করব। এখন কথা হচ্ছে—' তিনি কথা শেষ
করে, সকলের মুখের দিকে দেখে, চাঁদের দিকে তাকালেন।

চাঁদ দ্রুত ওর বন্ধুদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে বলল, 'স্যার কো
প্রাইভেট কথা আছে?'

'প্রাইভেট?' পতিতপাবনবাবু চিন্তিত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, তা মা
—না, ঠিক প্রাইভেট বলা যায় না। তোমরা আমার ছাত্র, তোমাদে
সঙ্গে আমার আবার প্রাইভেট কী থাকবে, অ্যাঁ?' বলে তিনি বাঁধা
দাঁতে হেসে, আবার সকলের মুখের দিকে দেখতে দেখতে, জিজ্ঞাসাসূচ
শব্দ করলেন, 'অ্যাঁ, কী?'

চাঁদ বলল, 'আপনি আমাকে কী বলবেন বলছিলেন?'

'হ্যাঁ, তোমার কাছেই দরকার।' পতিতপাবনবাবু বললেন, 'আম
বউমার কথা বলছি, মেজ বউমা। ভারি ছটফটে মেয়ে। দুটো বাচ্ছার
হয়ে গেল, তবু ছেলেমানুষি গেল না।'

চাঁদেরা সবাই অবাক জিজ্ঞাসু চোখে নিজেদের দিকে তাকালো
হঠাৎ মেজ বউমার প্রসঙ্গ কেন, কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, অতএ
কিছু বলারও নেই। সকলেই নির্বাক বিস্মিত চোখে পতিতপাবনবা
দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি হাতের লাঠির মোটা মাথায় ঘন ঘন হা
চাপড়াতে লাগলেন।

'আমি কত দিন মেজ বৌমাকে বলেছি, দ্যাখ মা, তোমাদে
শাশুড়ি মারা গেছেন। তোমরা একটু সমঝে বুঝে চলতে শেখো
পতিতপাবনবাবু বললেন, 'তোমাদের বয়সে তোমাদের শাশুড়ি রীতিম
গিন্নীবান্নি ছিলেন। আর তোমরা এখনো রবিঠাকুরের গান গাইছ, হা
পা তুলে নাচছ। এ সব করলে বিপদ তো হবেই।'

চাঁদ উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'বিপদ-আপদ কিছু হয়েছে নাকি স্যার?'

'হয়েছে বৈকি, নিশ্চয়ই হয়েছে।' পতিতপাবনবাবুর কপালে অনেকগুলো সর্পিল রেখা ফুটে উঠল, 'এই হপ্তা দুয়েক হল, বিয়ের একটা কানপাশা খুইয়ে বসে আছে।'

চাঁদ এবং সকলে একসঙ্গে উচ্চারণ করল, 'কানপাশা।'

'হ্যাঁ, কানপাশা।' পতিতপাবনবাবু বললেন, 'যেমন তেমন কানপাশা না, বেশ ভারি আর জড়োয়ার কানপাশা। একটু আগে গিয়ে, আমার মেজ ছেলে বলল, তুমি নাকি একটা কানপাশা কুড়িয়ে পেয়েছ, দেয়ালে লিখে লটকে দিয়েছ। অমনি আমার মনটা বলে উঠল, চাঁদ কুড়িয়ে পেয়েছে? এ তা হলে নিশ্চয়ই মেজ বউমার কানপাশা, এ আর দেখতে হবে না।'

পতিতপাবনবাবু উৎসুক চোখে চাঁদের দিকে তাকালেন। চাঁদ তাকালো বন্ধুদের দিকে। বন্ধুরা তাকালো চাঁদের মুখের দিকে। যতীন গলা-খাঁকারি দিয়ে, বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'হারানো কানপাশার জোড়ার আর একটা এনেছেন নাকি স্যার?'

'জোড়ার আর একটা?' পতিতপাবনবাবু আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'আর একটা কেন? দুটোই তো হারিয়েছে।'

চাঁদ বিনীত হেসে বলল, 'আমি স্যার একটা কুড়িয়ে পেয়েছি।'

'ওই একটা পেলেই যথেষ্ট।' পতিতপাবনবাবু হেসে বললেন, 'দুটোর বদলে একটা পাওয়াই কি কম ভাগ্যের কথা, অ্যাঁ? কী বল?'

চাঁদ আর ওর বন্ধুদের সকলের চক্ষুস্থির! অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডু বলেন কী। সকলেই মুখ-চাওয়াচায়ি করতে লাগল। পতিতপাবনবাবু বললেন, মেজ বউমাকে কতদিন বলেছি, একটু ভালভাবে চলাফেরা করো মা। কখন কিসের থেকে কী হয় কিছু বলা যায় না।'

শম্ভু বলে উঠল, 'দুটো কান থেকেই কানপাশা খুলে পড়ে গেছে?'

'কান থেকে পড়েছে, কি হাত থেকে পড়েছে, তা কি ছাই জানি? পতিতপাবনবাবু বললেন, 'শুনেছি, মেজ বউমা তার দুটো কানপাশা হারিয়ে ফেলেছে। কী ছেলেমানুষি বল তো?'

চাঁদের মনে অনেক কথা উদয় হলেও, উচ্চারণ করতে পারল না। একজন মহিলা দুটো কানপাশাই কেমন করে হারিয়ে ফেললেন, তা কিছুতেই ওর মাথায় আসছে না। তাও আবার কান থেকে, না হাত থেকে, তাও অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড্ স্যারের জানা নেই।

খোকন হেসে, সঙ্কুচিত হয়ে বলল, 'স্যার, আমরা লিখে দিয়েছি যাঁর কানপাশা হারিয়েছে, তিনি যেন উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যান।'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই!' পতিতপাবনবাবু উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, 'এটাই তো উচিত কাজ। কিন্তু চাঁদ তো আমার ছাত্র তোমরাও আমার ছাত্র, নয় কী? তোদের কাছে আমি আবার কী প্রমাণ দেব বল্?' তিনি একগাল হেসে উঠে বললেন, 'আমিই তো আমার প্রমাণ। আমি কি আর তোদের কাছে মিথ্যে কথা বলব?'

এমন একটা পরিস্থিতির কথা কেউ চিন্তাই করতে পারে নি। অথচ পতিতপাবনবাবুর মত ব্যক্তি এরকম একটা অযৌক্তিক দাবী পেশ করছেন কেমন করে, কারোর মাথায় আসছে না। প্রতিবাদ করাও কঠিন।

এই সময়েই হঠাৎ পরীর আবির্ভাব হল দরজায়, ঈষৎ ঘোমটা টেনে বলল, 'আচ্ছা ঠাকুরপো, কেন মাস্টারমশাইকে মিছিমিছি বসিয়ে রেখেছ? আসল কথাটা বলেই দাও না, কানপাশার ব্যাপারটা আমাদের নিজেদের একটা মজার ঘটনা। লোকের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করো, সেটা আলাদা। মাস্টারমশায়ের সঙ্গেও করবে?'

পরীর আকস্মিক আবির্ভাবের থেকেও, কথার চমকটা এতই বেশি কয়েক মুহূর্ত কারোর মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। পতিতপাবনবাবু হঠাৎ লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মজার ঘটনা মানে?'

পরী ঘোমটার পাশ থেকে হেসে উঠে বলল, 'ঠাকুরপো আমার বোনের কানপাশা কুড়িয়ে পেয়েছে তো! তাই নিয়ে, দেয়ালে লিখে টিখে মজা করছে। তা বলে আপনার সঙ্গেও মজা করবে? ছি ছি ছি আমি এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম, আর থাকতে পারলাম না।'

পতিতপাবনবাবু ভ্রূকুটি অবাক চোখে, পরী এবং সকলের মুখের দিকে বারে বারে তাকিয়ে দেখলেন। যতীন হেসে বলল, 'কিন্তু বউদি, সেটা আমরা ফাঁস করতে চাই নি। আগে আপনার বোন আসুক, তারপরে ফয়সালা। জানলেও আমরা কবুল করব কেন, ওটা আপনার বোনের কানপাশা ?'

পতিতপাবনবাবু গলা ঝেড়ে কাশলেন, বিষম বিরক্ত মুখে বললেন, 'নিজেদের মধ্যে পার, এসব তোমাদের দেয়ালে লিখে দেওয়া ঠিক হয় নি। ঠিকই তো, নিজেদের মজা, নিজেদের মধ্যেই রাখা উচিত।'

পরী বলল, 'আর বলেন কেন, সব ছেলেমানুষদের ব্যাপার।'

পতিতপাবনবাবু আর একটি কথাও না বলে, লাঠি ঠুকে ঠুকে বারান্দা থেকে নেমে চলে গেলেন। পরী সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি অবধি এসে, গলা খানিকটা তুলেই বলল, 'ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড়।' বলেই সকলের দিকে ফিরে তাকাল। যতীনকে বলল, 'এই তোমাদের মুরোদ ? বুড়ো ভামটা তো কানপাশা হাতিয়ে নিয়েছিল প্রায় !'

চাঁদ বলল, 'নিলেই হল আর কী ! আমি কি দিতাম নাকি ?'

যতীন একেবারে নিচু হয়ে পরীর পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকাল, বলল, 'বউদি, আপনার খুরে খুরে প্রণাম।'

পরী এক লাফে সরে গিয়ে বলল, 'থাক আমাকে আর পেন্নাম ঠুকতে হবে না। নিজেদের মাথার ঠিক রাখো।' বলেই ঘরের মধ্যে চলে গেল।

নিমাই যেন আচমকা ঘুম-ভাঙা স্বরে বলল, 'কিন্তু আমি এখনো অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডুর কথাটা বুঝতে পারছি না। লোকটা সত্যি বলছিল, না মিথ্যে বলছিল ?'

খোকন বলল, 'এলেমদার লোকের সত্যি মিথ্যা বলে কিছু নেই। কিন্তু শালা, জীবনে ঘেন্না ধরিয়ে দিল মাইরি।'

'প্রায় আমাদের কাত করে এনেছিল।' শম্ভু বলল।

চাঁদ বলল, 'এত সহজ না। আমি তো জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, কোন্ স্যাকরা ওঁর মেজ বউমার কানপাশা গড়িয়েছে ? তাকে ডেকে

এনে দেখতাম।'

'তাতে কাঁচকলা হত।' যতীন বলল, 'অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডু স্যাকরাকে বুঝিয়ে দিতেন, কানপাশাটা দেখেই যেন বলে, সে নিজে ওটা গড়েছে।'

চাঁদ ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'বললেই হল? আগেই আমি জানতে চাইতাম, কানপাশাটা দেখতে কেমন?'

'সে তো তুই প্রায় দেখতেই যাচ্ছিলি।' যতীন বলল।

চাঁদ ঘাড় নেড়ে বলল, 'মোটেই না। তবে হ্যাঁ, আমি সত্যি ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেছলাম। কিন্তু তোদের অবস্থাও আমার মত হয়ে গেছল।'

খোকন বলল, 'না হওয়ার কোন কারণ নেই। সত্যি, এমন মাস্টারের কাছে পড়ে, আমরা কিছুই শিখলাম না। গুরুদেব মাইরি!'

চাঁদ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'গুরুদেব বলে গুরুদেব! আমার মাথাটা সত্যি খারাপ হয়ে যাবে। একে প্রাক্তন শিক্ষক, তায় এই বয়স। এ লোক তো মানুষ খুন করতে পারে!'

'তা হয়তো পারে না, একটু বাজিয়ে দেখল।' খোকন বলল।

পরীর আবার আবির্ভাব হল, চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেলা ক'টা বাজল খেয়াল আছে? দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিলে, তারপরে তো লোকটা বেরিয়ে গেল। এখন খুঁজে-পেতে নিয়ে এসো।'

চাঁদ বলল, 'বাহ্, আমি তোমাদের ঝগড়া লাগিয়েছি? তোমরা কি আমার কথায় ঝগড়া কর?'

'আজ তো তুমিই লাগিয়েছ।' পরী বলল। এখন তার ঘোমটা খোলা। অন্যান্যদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরাই বল, ঝগড়াটা কে লাগাল? ঠাকুরপো আমাকে বোঝালে একরকম, আর দাদাকে বোঝালে আর একরকম। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে মরলাম।'

চাঁদ বলল, 'মোটেই আমি তোমাদের দুরকম বোঝাই নি। তোমার রাগ হয়ে গেল, তোমাকে কেন কানপাশা দেখাই নি। আর দাদাকে আমি বলেছি, কানপাশাটা ইচ্ছে করেই দেখাই নি, জানাজানি হওয়ার ভয়ে।'

'কিসের ভয় শুনি ?' পরী বলল, 'আমি জানলে দেখলে কি পাড়ায় পাড়ায় রটিয়ে বেড়াতাম ?'

যতীন বলল, 'সত্যি, চাঁদ এটা তোর খুব অন্যায়। বউদিকে তোর সব বলা উচিত ছিল।'

পরী বলল, 'থাক, এখন আর ওসব কথায় দরকার নেই। বেলা বারোটা বেজে গেল, তোমার দাদাকে ডেকে নিয়ে এসো। ছুটির দিন, মানুষটা বাজার করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এখনো চান করে নি।'

নিমাই বলল, 'বেলা বারোটা অবধিই অনুসন্ধানের টাইম দেওয়া ছিল। এখন কেউ এলে আর কথা হবে না।'

চাঁদ বলল, 'বউদি, তোমার এত ভালবাসা! জানতাম না।'

'তাহলে জানো।' পরী চোখে ঝিলিক দিয়ে বলল, 'আমাদের যত ঝগড়া, তত ভাব। এখন লোকটিকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।' বলে হেসে ভিতরে চলে গেল।

খোকন আবার বলল, 'সত্যি, বউদির জবাব নেই। চল, শশীদাকে খুঁজে নিয়ে আসি।'

এই সময়ে গেটের কাছে সাইকেল-রিক্সার ভেঁপু বেজে উঠল। সকলেই ফিরে তাকাল। মাথায় ঢাকা দেওয়া একটি সাইকেল-রিক্সা গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভিতরে একজন মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। বয়স অনুমান করা যাচ্ছে না, লালপাড় সাদা শাড়ি পরা মহিলা যে বেশ ফরসা, তা তাঁর হাত গলা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ছোট একটি ঘোমটা টানা, চুলের গোছা কানের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। বাঁ হাতে ঘড়ি

ঝকঝক করছে, নিচের দিকে লাল ভেলভেটের স্লিপারের কিছু অংশ দৃশ্যমান। রিক্সাওয়ালা বারান্দার দিকেই তাকিয়েছিল। আবার জোরে জোরে কয়েকবার ভেঁপুর শব্দ করল।

চাঁদ বারান্দার দিকে এগিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, কী চাই?'

রিক্সাওয়ালা বলল, 'একবার এদিকে আসুন বাবু।'

চাঁদ অবাক চোখে বন্ধুদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল। শম্ভু নিচু স্বরে বলল, 'কানপাশার খোঁজে এলে বলে দে না, বারোটা বেজে গেছে, এখন কোন কথা হবে না।'

শম্ভুর কথা শেষ হতে না হতেই, মহিলা রিক্সা থেকে নিজেই নামলেন। পাঁচ বন্ধুই মুগ্ধচোখে মহিলাকে দেখল। বয়স প্রায় তিরিশ হলেও, অপরূপ লাবণ্যময়ী সুন্দরী, এবং দেখলেই অভিজাত বলে মনে হয়। কপালে সিঁদুর নেই, সিঁথেয় আবছা রেখা। কাজলকালো চোখে বারান্দার দিকে তাকালেন, ঠোঁটের কোণে ঈষৎ বিব্রত লজ্জার হাসি। গেটে একটি হাত রেখে, সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'চন্দ্রনাথ হালদারের বাড়ি?'

চাঁদ বলল, 'হ্যাঁ।'

'তিনি কি এখন বাড়ি আছেন?' মহিলা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

চাঁদ বলল, 'আমিই।'

'ওহ্! আসতে পারি?' মহিলা কুণ্ঠিত হেসে অনুমতি চাইলেন।

নিমাই বলে উঠল, 'আসুন না, আসুন।' বলতে বলতে সিঁড়িতে পা দিতে গেল।

খোকন নিমাইয়ের হাত টেনে ধরে সরিয়ে নিয়ে এল, নিচু শক্ত স্বরে বলল, 'আসতে দে না, তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

নিমাইয়ের দু-চোখ রাগে জ্বলে উঠল। খোকনের হাতে ঝাপটা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। মহিলা ইতিমধ্যে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এসেছেন। বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়ি দেখে বললেন, 'কুড়ি মিনিট দেরি হয়ে গেছে।'

যতীন বলল, 'তাতে কী হয়েছে? আপনি কানপাশার খোঁজে এসেছেন তো?'

'হ্যাঁ।' বলতে বলতে মহিলা বারান্দায় উঠে এলেন, 'আমি দু-এক মিনিটের বেশি সময় নেব না।'

চাঁদ চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন না। আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

মহিলা না বসেই বললেন, 'খুব কাছে থেকেই আসছি। নিধিরাম ঘাটের কাছে আমাদের বাড়ি।'

খোকন বলে উঠল, 'তাই ভাবছিলাম, আপনার মুখ চেনা লাগছিল। আপনি বোধহয় নির্মলশশী নিবাস থেকে আসছেন?'

মহিলা হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তবে সেটা আমি জানাজানি করতে চাই না।' বলে চাঁদের দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি একটা কানপাশা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন?'

চাঁদ বলল, 'হ্যাঁ।'

'সেটা কানের ফুল নয় তো?' মহিলা বলতে বলতে, তাঁর হাতের বটুয়া খুলে, ছোট্ট একটি সুদৃশ্য বাক্স বের করলেন।

চাঁদ বলল, 'না, আমি যেটা পেয়েছি, সেটা কানপাশাই।'

মহিলা ছোট বাক্সটি খুলে, চাঁদের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এটা একটু দেখুন।'

চাঁদ দেখল, এবং সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল। একটি শোভন উজ্জ্বল কানের ফুল, মাঝখানে কম করে সাত-আট রতির মত একটি উজ্জ্বল রত্ন। চাঁদ বলল, 'না, এরকম জিনিস আমি পাই নি। আচ্ছা, এ পাথরটা কিসের?'

মহিলার মুখে ঈষৎ লাল ছটা লাগল, হেসে বললেন, 'হীরে।' বলেই তিনি বাক্সটি বন্ধ করে বটুয়ার মধ্যে ভরে বললেন, 'অবিশ্যি, আমার কানের হীরের ফুল হারাবার কোন কারণ নেই। আমি ঠিকই অনুমান করেছি, একটি ফুল চুরি গেছে। তবু ভাবলাম, চোরের হাত ফস্‌কেও

হারাতে পারে।' বলে তিনি হেসে উঠলেন, এবং কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, চলি, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের সময় নষ্ট করলাম।'

চাঁদের সঙ্গে কয়েকজনই বলে উঠল, 'না না, সময় নষ্ট কিসের?'

মহিলা বারান্দা থেকে নেমে, মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমার কথাটা কারোকে বলবেন না। বুঝতেই পারছেন, বাড়ির লোকদের জানাতে পারি নি যে, ফুলটা চুরি গেছে। আর সেই জন্যই আমি একটু দেরিতে এসেছি।'

চাঁদ উৎসুক হয়ে বলল, 'না না, কারোকে কিছু বলব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

মহিলা চলে গেলেন। পাঁচ বন্ধু যেন চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। সকলেই দেখল, রিক্সাটা চলে গেল। নিমাই বলল, 'গন্ধটা কিসের ছড়িয়ে রয়েছে? আতর, না সেন্টের?'

খোকন বলল, 'মনে হচ্ছে, হাবু মুখুজ্যের বউ। দারুণ দেখতে, না?'

যতীন বলল, 'শুনেছি হাবু মুখুজ্যের বউয়ের নাম প্রতিমা।'

'তার মানেই লটঘট।' শম্ভু বলল।

খোকন বলল, 'কিসের লটঘট?'

চাঁদ বলে উঠল, 'দীপক ঘোষের সঙ্গে তো? গায়ক?'

শম্ভু হেসে বলল, 'সবই তো জানিস গুরু!'

চাঁদ বলল, 'এখন মনে পড়ছে, বেশ কয়েকদিন দীপক ঘোষের সঙ্গে দেখেছি। কলকাতায়ও যাওয়া-আসা হচ্ছে আজকাল।'

যতীন বলল, 'নাও, এবার শালা পরের বউয়ের কেচ্ছা আরম্ভ হল। চল্ চল্, বেরিয়ে পড়ি।'

চাঁদ বলল, 'কিন্তু হীরের ফুলটা দেখলি? হীরেটার কত দাম হবে ভাবতে পারিস? মিনিমাম পাঁচ হাজার টাকা!'

'আহ্, শালা যদি পাওয়া যেত!' শম্ভু বলল, 'ফিরিয়ে দিয়েও সুখ ছিল।'

সবাই হেসে উঠল। যতীন বলল, 'তোরও তা হলে পরের জিনিস ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে? এ জন্যেই বলে, সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়!'

নিমাই বলল, 'সুন্দর মুখই শুধু বলিস না, প্রতিমা মুখার্জির অন্য অ্যাপিলটার কথাও বল। দীপক ঘোষের উচিত, প্রতিমাকে একটা হীরের কানের ফুল গড়িয়ে দেওয়া।'

চাঁদ বলল, 'ওসব কথা ছাড়। প্রতিমার কানের ফুলের হীরেটা দেখে, এখন কানপাশাটা আমার দেখতে ইচ্ছা করছে।'

খোকন বলল, 'হ্যাঁ একবার দেখেই নিই। কাল রাত্রে অন্ধকারে ভালো করে দেখা হয় নি। এখন দিনের বেলা একবার দেখে নেওয়া যাক।'

'ঠিক বলেছিস।' যতীন বলল, 'নিয়ে আয় চাঁদ।'

চাঁদ বলল, 'আমার ঘরে আয় সবাই।'

চাঁদের সঙ্গে সবাই ওর শোবার ঘরে গেল। চাঁদ ওর আয়না-বসানো টেবিলের ড্রয়ার খুলে, একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল। খালি প্যাকেটের মুখ খুলে, তার ভিতরে, আঙুল ঢুকিয়েই, ওর ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল। প্যাকেটের ভিতরটা ভালো করে দেখে, সেটা একটানে ছিঁড়ে ফেলল। রাংতা আর সিগারেটের তামাকের গুঁড়ো ছাড়া, ভিতরে কিছুই নেই। চাঁদের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল, বলল, 'এ কি, কানপাশাটা তো এই প্যাকেটের মধ্যেই রেখেছিলাম, গেল কোথায়?'

সকলের চোখে-মুখেই বিস্মিত জিজ্ঞাসা। যতীন বলল, 'প্যাকেটের মধ্যেই রেখেছিলি তো?'

'নিশ্চয়ই।' চাঁদ বলতে বলতে, বড় ড্রয়ারটা গোটাটাই টেনে খুলে ফেলল। গোটা কয়েক টুকিটাকা জিনিস ছাড়া ভিতরে কিছুই নেই। চাঁদ উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে বলল, 'আশ্চর্য তো! কানপাশাটা তো আমি এখানেই রেখেছিলাম!'

খোকন বলল, 'বাকী ড্রয়ারগুলো খুলে ছাখ।'

চাঁদ প্রত্যেকটি ড্রয়ার খুলে খুলে দেখল। সমস্ত জিনিস ওলট-পালট

করল। চাঁদের মুখে ঘাম দেখা দিল। ও স্যুটকেশ খুলে, জামাকাপড় বের করে ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। যতীন বলল, 'কাল রাত্রে যে-জামা গায়ে দিয়েছিলি, তার পকেটটা দ্যাখ তো।'

দেওয়ালের র‍্যাকের গায়ে ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেট, খোকন নিজেই দেখল। পকেট শূন্য, কিছুই নেই। শম্ভু আর নিমাই ঘরের চারদিকে, খাটের তলায় খুঁজতে আরম্ভ করল। চাঁদ উদ্বেগে আর উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল, বলল, 'সর্বনাশ, কী হবে?'

'তোর ঘরের দরজা কি রাত্রে খোলা থাকে?' যতীন জিজ্ঞেস করল।

চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'কখনোই না। যদিও খুলে শুলেও কোন ভয় নেই, দরজাটা তো ভেতর-বাড়ির। তবু আমার অস্বস্তি হয়, কী অবস্থায় শুয়ে থাকব কে জানে! ভোরবেলা উঠে খুলে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ি।'

খোকন জিজ্ঞেস করল, 'সকালে তোর ঘরে কে কে এসেছে?'

চাঁদ বলল, 'মালা বিছানা তুলেছে, ঘর পরিষ্কার করেছে। বাইরের লোক কেউ আসে নি।'

বলেই ও চিৎকার করে ডাকল, 'মালা, এই মালা!'

নিমাই বলল, 'হয়তো অন্য প্যাকেটে রেখেছিলি, মালা সেটা ঝেঁটিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে।'

নিমাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই, মালা ছুটে এসে বলল, 'কী বলছ ছোড়দা?'

'তুই আমার ড্রয়ারে হাত দিয়েছিলি?' চাঁদ সন্দিগ্ধ উদ্বেগে জিজ্ঞেস করল।

মালা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'না তো। আমি তো কোনদিন ওসবে হাত দিই না।'

যতীন জিজ্ঞেস করল, 'ঘর থেকে কোন কাগজের মোড়ক বা সিগারেটের প্যাকেট ঝাড়ু দিয়ে ফেলেছিলি? মনে আছে?'

মালা একটু ভেবে মাথা নেড়ে বলল, 'না, সেরকম কিছু ছিল না তো।'

যতীন বলল, 'হ্যাঁ রে চাঁদ, কাল রাত্রে পালেদের পোড়ো বাগান থেকে ফেরার সময়, পকেট থেকে পড়ে-টড়ে যায় নি তো ?'

'কক্‌খনো না।' চাঁদ বলল, 'কাল রাত্রে আমি কানপাশাটা খুলে দেখেছি, সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ড্রয়ারে রেখেছি।'

শম্ভু বলল, 'কিন্তু আজ সকালে তো দেখিস নি ?'

'দেখবার দরকার মনে করি নি, তাই দেখি নি।' চাঁদ বলল।

খোকন বলল, 'ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিরি কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে দেখছি। জোড়ার আসল কানপাশাটা নিয়ে কেউ যদি আসে, তখন কী হবে ?'

যতীন বলল, 'যদি আবার কী ? যার কানপাশা হারিয়েছে, আমাদের নোটিসের কথা সে জানবেই, খোঁজ নিতেও ঠিক আসবে।'

'ওহ্‌! আমার মাথাটা এবার সত্যি খারাপ হয়ে যাবে।' চাঁদ সত্যি মাথায় হাত দিয়ে খাটে বসে পড়ল।

খোকন বলল, 'মাথা খারাপ করলে তো হবে না। করলেও যমে ছাড়বে না। নোটিস দিয়ে এখন কানপাশা হারালে, সত্যি সত্যি পুলিসের হাঙ্গামায় পড়তে হবে।'

নিমাই বলে উঠল, 'ওরে বাবা, আমি শালা আর এসবের মধ্যে নেই। পুলিসকে আমার বড্ড ভয়।'

যতীন বলল, 'বউদিকে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না ?'

মালা তখনও দাঁড়িয়েছিল। খোকন বলল, 'এই যা তো, বউদিকে একবার আসতে বল।'

মালা ছুট দিল। চাঁদের মাথা তখন ভোঁ ভোঁ করতে আরম্ভ করেছে। ওর সারা গা দিয়ে ঘাম ছুটছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই, চোখের কোল বসে, মুখটা চুপসে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ আর বিভ্রান্তি।

পরী এসে ঘরে ঢুকল, বলল, 'আবার তোমাদের কী হল ?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে বউদি।' যতীন বলল, 'কানপাশাটা চাঁদ

সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে পুরে, ড্রয়ারে রেখেছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

পরী চোখ বড় করে বলল, 'যাচ্চলে, যা নিয়ে এত কাণ্ড, সেটাই খোয়া গেছে?'

চাঁদ পরীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। পরী চাঁদের দিকে দেখে বলল, 'এখন কী করবে?'

'আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।' চাঁদ বলল, 'তাছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

পরী বলল, 'ও বাবা, সে আর এক কেলেঙ্কারী। বাড়িতে এসে পুলিস তোলপাড় করবে। তাছাড়া আইবুড়ো দেওর গলায় দড়ি দিলে, বউদির দিকেই আগে সকলের নজর পড়বে, কী বল যতীন ঠাকুরপো?'

যতীন অবাক চোখে পরীর দিকে তাকাল। বউদির স্বরে কি কৌতুকের আভাস? ও বলল, 'গলায় দড়ি দিলেও পুলিস আসবে, কানপাশাটা হারালেও পুলিস আসবে। এখন কী উপায়, তাই বলুন।'

'আমি কী উপায়ের কথা বলব ভাই।' পরী যেন অসহায় উদ্বেগে বলল, 'আমি তো কানপাশার সাত-পাঁচ কিছুই জানি না। ঠাকুরপো আগে আমাকে কিছুই বলে নি। ভেবেছিল, পাছে আমিই কানপাশাটা মেরে দিই।'

চাঁদ ক্ষীণ করুণ স্বরে বলল, 'তোমার পা ছুঁয়ে বলছি বউদি, আমি মোটেই তা ভাবি নি। লোক-জানাজানির জন্যই আমি গোপন করতে চেয়েছিলাম।'

'তার দরকারও ছিল।' যতীন বলল, 'আপনি তো নিজের চোখেই দেখলেন বউদি, কত রকমের ফেরেববাজ কানপাশাটা হাতাবার তাল করছে।'

পরী বলল, 'তা আর দেখি নি? বুড়ো মাস্টারটা পর্যন্ত শকুনের মত ঝাঁপিয়ে এসেছে! কিন্তু তোমরা তোমাদের দাদাকে খুঁজে আনতে গেলে না?'

'তাই তো যাচ্ছিলাম বউদি।' খোকন বলল, 'তার আগে কান-পাশাটা একবার দেখতে এসে, আক্কেল গুড়ুম। চাঁদের সঙ্গে এখন আমরাও ফ্যাসাদে পড়ে গেছি।'

পরী চোখের কোণে একবার চাঁদকে দেখে বলল, 'তা বেশি ওস্তাদি করতে গেলে, আক্কেল গুড়ুম তো হবেই। তা না হলে, ওরকম একটা দামী জিনিস কেউ ওভাবে খোলা ড্রয়ারে রাখে?'

সকলের চোখে-মুখেই একটা ব্যাকুল প্রত্যাশা আর উদ্বেগ। সকলেই পরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরী আবার বলল, 'আমার তরকারী পুড়ে যাচ্ছে উনোনে, আমি আর দেরি করতে পারছি না। তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের দাদাকে খুঁজে ডেকে নিয়ে এস।' বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল।

যতীন দু' পা এগিয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু বউদি—'

'যা বলছি, তাই কর।' পরী মুখ ফিরিয়ে বলল, তার কৌতুকের ছটায় ঝিলিক হানা দৃষ্টি চাঁদের দিকে।

চাঁদ খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে, চিৎকার করে উঠল, 'বউদি!'

পরী বলল, 'আমার তরকারী পুড়ে যাচ্ছে।'

চাঁদ ছুটে পরীর সামনে গিয়ে বলল, 'বউদি, ওহ্, তোমাকে আমার ইয়ে করতে ইচ্ছে করছে।'

পরী ঝটিতি সরে গিয়ে, উৎকণ্ঠিত স্বরে ধমক দিয়ে বলল, 'আমাকে আবার তোমার কী করতে ইচ্ছে করছে, অ্যাঁ? গায়ে হাত দিলে মারব কিন্তু।'

'না না, পেন্নাম করতে ইচ্ছে করছে।' বলেই চাঁদ পরীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

খোকন চিৎকার করে উঠল, 'থ্রি. চিয়ার্স ফর বউদি।'

বাকীরা চিৎকার করে বলল, 'হিপ্ হিপ্ হুররর-রে।'

পরী প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল। মালা তখন খিলখিল করে হাসছে। যতীন চাঁদকে মেঝে থেকে তুলে বলল, 'আর পড়ে থাকতে হবে না,

বউদি চলে গেছে।'

'সত্যি, বউদির জবাব নেই।' খোকন আবার বলল।

চাঁদকে নিয়ে সবাই আপাততঃ দাদাকে খুঁজতে চলল।

চার সপ্তাহ—চারটি রবিবার অতিক্রম করে গেল, কানপাশার প্রকৃত দাবীদারের দেখা পাওয়া গেল না, কিন্তু চাঁদের মাথাটা সত্যি খারাপ হতে বসেছে। সেটাও ওর একলার না, মাথা খারাপ অবস্থা ওর বন্ধুদেরও। সেই সঙ্গে ওর দাদা-বউদিরও। বউদির মাথা খারাপ, ছুটির দিনে বাড়িতে দুবেলা লোকের ভিড়। ছুটির দিন ছাড়াও, কানপাশার খোঁজে, যখন-তখন অনুসন্ধানী নারী-পুরুষের আবির্ভাব, আর তার মোকাবিলা করতে হচ্ছে পরীকে। তার অবাক ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা, 'লোক-গুলো কি চোখের মাথা খেয়েছে? ভাল করে নোটিসটাও পড়ে নি? দিন নেই, ক্ষণ নেই, যখন-তখন বাড়িতে এসে হাঁক-ডাক করে কড় নাড়লেই হল?'

তথাপি পরীকেই যেন কিছু কিঞ্চিৎ খুশি দেখায়। তার ধারণা অথবা প্রত্যাশা, কানপাশার দাবীদার কেউ নেই। থাকলেও, সে আর ইহজগতে নেই। তার এই মনোভাব নিয়ে, স্বামীর সঙ্গে কেবল মতবিরোধ না, রীতিমত বিবাদ চলছে। চাঁদের পক্ষে এই পরিস্থিতি আরো দুঃসহ।

বস্তুতঃ চাঁদের অবস্থাই সব থেকে মর্মান্তিক। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী রবিবার আর ছুটির দিনের দুবেলায় নানা ধরনের লোকের ভিড় তে আছেই। রাস্তাঘাটে বেরোলেও সকলের একটিই জিজ্ঞাসা, এবং তার

সঙ্গে নানারকমের মন্তব্য। কারখানায় যেতে, ট্রেনে সহযাত্রীদেরও একই কথা। এমন কি কারখানায়, ওর বেয়নেট সেকশনেও, কাজের সময়েও, সহকর্মীদের, কানু ছাড়া গীত নেই। সেকশন থেকে ক্যান্টিনে, ক্যান্টিন থেকে ইউরিনাল বাথরুমে, কোথাও নিষ্কৃতি নেই। কানপাশা কানপাশা কানপাশা! এ বিষয়ে জবাব এবং কৈকিয়ত দেওয়াটা যেন একটা বাধ্যবাধকতার দায়।

সারাদিনের কাজের শেষে, এর থেকে রেহাই নেই ক্লাবে গিয়েও। কানপাশা নিয়ে কত রকমের যুক্তি-তর্ক-গল্পের উদ্ভব যে হতে পারে, আগে কখনো ভাবা যায় নি। তার ধাক্কাটা যতীন খোকন শম্ভু নিমাইয়ের ওপরও এসে পড়ে। তর্ক থেকে এমন উষ্মার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, হাতাহাতির উদ্যোগ হয়।

চাঁদ মাঝে মাঝে অবাক হয়, এত মেয়ের কানের অলঙ্কার কী করে হারায়! মতলববাজ ফেরেববাজদের কথা বাদ দিলেও, কানের দুল, কানপাশা, ফুল, মাকড়ি, রিং হারানোর প্রকৃত সংখ্যাও বিস্ময়কর। একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে, চাঁদের এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাটি হল। তাবত দেশের হিসাব হলে, মেয়েদের অলঙ্কার হারানোর পরিসংখ্যান, একটি রীতিমত সমীক্ষার বিষয়। এই সঙ্গে, মতলববাজদের একটা পরিসংখ্যানও নেওয়া যেতে পারে।

অনুসন্ধানীদের মধ্যে এরকম মতলববাজদের ভিড়ও কম হচ্ছে না। তারা বিভিন্ন চরিত্রের, বিভিন্ন পেশার লোক, এবং তাদের মধ্যে কয়েক-জন স্ত্রীলোকের দেখাও পাওয়া গিয়েছে। চাঁদের মনে হয়েছে, আসলে এরা এক ধরনের সুযোগ-সন্ধানী তঞ্চক।

শহরের স্বর্ণকার গোপাল খবরটা জানার পর থেকেই, চাঁদের পিছনে লেগে আছে। তার বক্তব্য, চাঁদ বৃথাই কানপাশার প্রকৃত দাবীদারের অপেক্ষা করছে। এটা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ছাড়া কিছুই না। তার চেয়ে কানপাশাটা গোপালকে বিক্রী করে দেওয়া অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। এবং তার ধারণা, চাঁদ কানপাশাটা বিক্রী করে

দেবার কথাই নিশ্চয় ভাবছে, কেবল দর বাড়াতে চাইছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, গোপাল স্বর্ণকার আটশো টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী হয়েছে।

চাঁদ হাসবে না কাঁদবে, কিছু বুঝতে পারে না। এর ওপরে, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে, দাদা-বউদির ঝগড়া লেগেই আছে। আদৌ যার কোন মাথামুণ্ডু নেই। কিন্তু বাড়িতে টেকা দায়।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কী? এক মাসের ওপর হয়ে গেল, এখনো প্রকৃত দাবীদার এসে জুটল না? কাক-পক্ষীরও বিষয়টা জানতে বাকী নেই। লোকের ভিড়ের অন্ত নেই, অথচ আসল লোকের পাত্তা নেই। যার কানপাশা, সে কি এ তল্লাটের লোক না? তাও যদি না হয়, খবর পাওয়া উচিত ছিল। খবর পেয়ে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে লোক সন্ধান করে গিয়েছে। কে এমন মানুষ হতে পারে, সে নারী বা পুরুষ, যা-ই হোক, এমন একটা দামী জিনিস হারিয়েও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে?

কানপাশা আর কানপাশার মালিককে নিয়ে, চাঁদের জল্পনা-কল্পনারও শেষ নেই। সে কি বৃদ্ধা না তরুণী, বিবাহিতা না অবিবাহিতা, বহুরকম চিন্তার মধ্য দিয়ে, বহু রকমের চেহারা ওর চোখের সামনে জেগে উঠল, ভেসে গেল, কিন্তু দিশা কিছুই মিলল না। এমন কি মিত্তিরদের পোড়ো বাগানের যেখানে কানপাশাটা কুড়িয়ে পেয়েছিল, সেখানেও চাঁদ উঁকি না দিয়ে পারে নি। কেমন একটা চুম্বকের মত আকর্ষণই যেন ওকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছে। অনেকটা, খুনী যেমন তার খুনের জায়গায়, লুকিয়ে একবার ঘুরে আসে, সেইরকম। অথচ ও চুরিও করে নি, খুনও করে নি। তথাপি সেই জায়গাটিতে গিয়ে ও কল্পনা করার চেষ্টা করেছে, কে কবে গিয়েছিল এ পথ দিয়ে, যার কান থেকে কানপাশা খুলে পড়ে গিয়েছিল। এমন ভাবে কানপাশাটা পড়েছিল, নিতান্ত অসাবধানেই ওরকম ঘটতে পারে। চাঁদের এখন মনে হতে লাগল, বিষয়টা হত্যা-রহস্যের থেকেও জটিল। আদৌ কি কান-পাশার প্রকৃত দাবীদার কোনদিন আসবে? ওর বন্ধু যতীন আর

খোকনও এখন আশা হারাতে আরম্ভ করেছে। শম্ভু আর নিমাই উৎফুল্ল হয়ে উঠছে, শেষ পর্যন্ত ওদের ইচ্ছাই ফলবতী হবে।

চাঁদ কানপাশাটা বউদির হেফাজতেই রেখেছে। কারণ সেটাই নিরাপদ। কিন্তু বউদিরও আশা, কানপাশার দাবী করতে আর কেউ আসবে না। অতএব, 'ঠাকুরপো, ওটা তোমার বউয়ের কপালেই নাচছে। কানপাশার হীরা-মুক্তা-সোনা দিয়ে, আমি অন্য কিছু গড়িয়ে, তোমার বউয়ের মুখ দেখব। আর আমার বোনকে যদি বিয়ে কর, ঠিক অমনি আর একটি কানপাশা আমার বাবাকে গড়িয়ে দিতে বলব।'

চাঁদের পক্ষে এসব কথার জবাব দেওয়া কঠিন, কারণ এসব কথার কোন জবাব হয় না।

ঘটনার ষষ্ঠ রবিবারের আগের দিনের শনিবারের সন্ধ্যায়, যতীন কথায় কথায় চাঁদকে জানায়, কলকাতা থেকে ওর এক পিসতুতো শালী এসেছে। অবিবাহিতা শালীটি, চাঁদকে তার হাত দেখাতে চায়। একটা ছকও নাকি সঙ্গে করে এনেছে। কলকাতা থেকে ইতিপূর্বেও ওর এই শালী দু-তিনবার এখানে বেড়াতে এসেছে। তখন সে চাঁদের জ্যোতিষীর কথা শুনেছে। এবার সে একেবারে নাছোড়বান্দা। শালী বলেছে, চাঁদকে হাত আর ছক দেখাবার জন্যই বিশেষ করে এবার এখানে এসেছে।

চাঁদ রুখে উঠে বলেছিল, 'রাত পোহালে কানপাশার জন্য রাজ্যের আজেবাজে লোক আসে। তাদের সঙ্গে কথা বলব, না তোর শালীর হাত আর ছক দেখব, শুনি?'

যতীন বলেছিল, 'আমি বেণুকে (শালী) নিয়ে একটু আগেই যাব, তুই দু' মিনিটে যা হোক একটু দেখে দিস। তুই আমার বন্ধু, বেচারী কলকাতা থেকে এসেছে, একটু না দেখে দিলে ভারি বেইজ্জৎ হয়ে যাব। কানপাশার জন্য যারা আসবে, তাদের আমরা দেখব।'

চাঁদ মোটেই খুশি হয় নি। দেড় মাসে, জ্যোতিষী চর্চা ওর মাথায়

উঠে গিয়েছে। কিন্তু যতীনকে ফেরানোও ওর পক্ষে কঠিন। অন্যান্য বন্ধুরা যতীনের পিছনে লেগেছিল। যতীন বলেছিল, 'আইবুড়ো মেয়েরা তো জানতে চায় একটা মাত্র কথা। কবে বিয়ে হবে, বর কেমন হবে। চাঁদ দু মিনিটেই তার জবাব দিয়ে দিতে পারে।'

চাঁদ রাজী হয়েছিল, কিন্তু রবিবারের সকালেও না, বিকালেও না, সন্ধ্যাবেলায়। কারণ চাঁদের কাছে এখনো কানপাশার অনুসন্ধানীদের সঙ্গে দেখা করাটাই বড় কথা। বলা যায় না, যে-কোন দিনই আসল দাবীদার এসে পড়তে পারে। অতএব সেই সময়টি বাদ দিয়ে, যতীনের শালীর হাত আর ছক দেখা হবে।

সেই কথানুযায়ী যতীনের সঙ্গে রবিবারের সন্ধ্যায়, ওর পিসতুতো শালী বেণু এল চাঁদের বাড়িতে। চাঁদের মনটা মোটেই ভাল ছিল না, কারণ প্রকৃত দাবীদার কেউ আসে নি। যতীন পরিচয় করিয়ে দিল বেণুর সঙ্গে। বেণুকে দেখে চাঁদের হতাশা আর বিরক্তি ভরা মনটা একটু দুলে উঠল। বিব্রত সংকোচের মধ্যেও, গুমোট মনের কোথায় যেন একটু বাতাস লেগে গেল।

লাগবার কথা। নাতিদীর্ঘ, স্বাস্থ্যবতী বেণু অষ্টাদশী কী না, সে-হিসাব পাওয়া সম্ভব না, কিন্তু সে তন্বী শ্যামা শিখরদশনা বটে। আয়ত চোখ দুটি বিস্তৃত, কালো তারা দুটি তারুণ্যের কৌতুকে ঝলকানো। আজকাল চুল বাঁধাটা সব সময়ে সাজসজ্জার মধ্যে পড়ে না। বেণুরও নরম কালো চুল খোলা, ঘাড়ের পাশ দিয়ে পিঠে ছড়ানো। লালপাড় বেগুনি রঙের শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে, ওর দু হাতে লাল বেগুনি বেলোয়ারি চুড়ির গোছা। এ ছাড়া, নাকে একটি ক্ষুদ্র নথের মত রিং লাগানো, আর কোন অলঙ্কার নেই।

বেণুর মুখে ছিল সলজ্জ হাসি, কিন্তু দু চোখের তারা দিয়ে যেন চাঁদের সুদূর হৃদয় পর্যন্ত বিদ্ধ করে দেখল। বেণুর দৃষ্টিপাতে, চাঁদ নিজেই কেমন বিব্রত হয়ে উঠল, এবং খুশি হয়ে আর একবার তাকাতে গিয়ে, লজ্জা পেয়ে গেল। অথচ তৃষ্ণাটা রইল জেগে।

পরিচয়ের পালাটা কোনরকমে কপালে হাত ঠেকিয়ে সারবার পরেই, যতীন বলল, 'মনে রেখো বেণু, চাঁদকে আমি অনেক বলে-কয়ে রাজী করিয়েছি। তোমাকে আগেই বলেছি, ওর মন-মেজাজ মোটেই ভালো নেই। তুমি বেশিক্ষণ সময় নেবে না।'

বেণু হেসে উঠে একবার চাঁদকে দেখে নিয়ে বলল, 'আহ্, যতীনদা, সে কথা তো অনেকবার বলেছেন। সেই কানপাশার ব্যাপার তো? আমি তো বলেছি, আমি মোটেই দেরি করব না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' চাঁদ বলে উঠল, 'এসে যখন পড়েছেন, আমি যতটুকু যা পারি, তা দেখে দেব।'

বেণু কিঞ্চিৎ ঠোঁট ফোলানো অভিমানের স্বরে বলল, 'দেখুন না, যতীনদা খালি আমার পেছনে থোক কাটছেন। আপনার কথা এত শুনেছি, অনেকবার ভেবেছি আসব।'

চাঁদ বলল, 'না না, আমার কথা আর বেশি শোনবার কী আছে। একটু-আধটু চর্চা করি।'

বেণু বলল, 'ইস, একটু-আধটু! লোকে বলে, আপনার কথা দৈববাণীর মত সত্যি।'

চাঁদ লজ্জায় আর সঙ্কোচে বলে উঠল, 'না না, এ আবার কী কথা!'

যতীন হেসে উঠল, বলল, 'ঠিক আছে বেণু, চাঁদকে আর তেল দিতে হবে না। তোমার হাত ছক ও দেখে দেবে।'

বেণু চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'দেখছেন তো যতীনদা কি সব বলছে? আমি নাকি আপনাকে তেল দিচ্ছি। বেশ, তাহলে থাক।'

চাঁদ বলে উঠল, 'আপনি যতীনের কথায় কান দিচ্ছেন কেন? ওর কথা ছাড়ুন।'

যতীন একবার চাঁদের দিকে দেখে নিয়ে, বেণুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও বাবা, আবার মেজাজও দেখাচ্ছ?'

'মোটেই মেজাজ দেখাই নি।' বেণু ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তা

বলে আপনি যা-তা বলবেন কেন? গুণীকে গুণের কদর করলে বুঝি তেল দেওয়া হয়? আপনিই তো বলেছেন, চাঁদবাবুর জ্যোতিষী একে বারে অব্যর্থ।'

চাঁদ এসব কথায় লজ্জা পাচ্ছিল, আর তা থেকে মুক্তির জন্য বলল 'ওসব কথা থাক, আপনি বসুন।'

'দ্যাখ্, চাঁদ, বেণুকে তুই আপনি আপনি করে বলিস না।' যতী বলল, 'ও আমার বউয়ের থেকে মিনিমাম চার বছরের ছোট।'

চাঁদ বলল, 'আচ্ছা, সেটা পরে দেখা যাবে।'

'পরে না, এখনই।' বেণু বলল, 'কিন্তু একটা কথা।' বলে যতীনের দিকে ফিরল, 'আমি যখন হাত দেখাব, যতীনদা তুমি সামনে থাকতে পারবে না। তা হলে আমি একটা কথাও ওঁকে বলতে পার না।'

চাঁদের সঙ্গে যতীনের দৃষ্টি-বিনিময় হল। যতীন চোখের ইশার করে বলল, 'বুঝেছি বুঝেছি, তুমি কী বলবে। ঠিক আছে, আমি সামনে থাকব না। তা বলে আমার বন্ধুর সঙ্গে যেন আবার কোনরকম ইবে বাঁধিয়ে বোস না। নারীজাতি বলে কথা।'

বেণু ওর কালো সরু ভুরু কুঁচকে বলল, 'ইয়ে মানে?'

চাঁদ ধমক দিয়ে বলল, 'এই যতীন, কী সব বাজে কথা বকছিস ক্লাবে যেতে দেরি হয়ে যাবে।'

যতীন হেসে বলল, 'ও. কে.। আমি তাহলে ক্লাবেই চলে যাই তুই বেণুর হাত-ফাত দ্যাখ।'

চাঁদ বেণুকে দেখিয়ে বলল, 'তারপরে ও তোদের বাড়ি ফিরবে কেমন করে?'

'সে আমি ঠিক চলে যাব।' বেণু বলল, 'কাছেই তো, বেশি দূরে তো নয়।'

'আরে ওরা হল কলকাতার মেয়ে!' যতীন বলল, 'ওদের এত ভয় নেই। না হয়, তুই তো আছিস। বেণুকে আমাদের বাড়ির কাছে ছেড়ে

দিয়ে, ক্লাবে চলে আসিস।'

এই সময়ে পরী বাইরের ঘরে ঢুকল। বিশেষ করে বেণুকেই দেখে নিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, কানপাশার মালিককে পাওয়া গেল নাকি?...'

যতীন বলল, 'না বউদি, কানপাশার মালিক না, ও আমার পিসতুতো শালী, কলকাতা থেকে এসেছে। অনেক দিনের সাধ, ওর হাত আর ছক চাঁদকে দেখাবে, তাই নিয়ে এসেছি।'

পরী দমকা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তবু বাঁচোয়া। আমি ভাবলাম, আবার কেউ বুঝি কানপাশার খোঁজে এসেছে।'

যতীন বেণুকে বলল, 'ইনি হলেন আমাদের বউদি—অর্থাৎ চাঁদের বউদি।'

বেণু কয়েক পা এগিয়ে, পরীকে নিচু হয়ে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পরী ব্যস্তত্রস্ত হয়ে বলল, 'আহা থাক থাক, এসব আবার কেন ভাই?' বলে বেণুর চিবুকে হাত দিয়ে, মুখটি তুলে ধরে দেখে বলল, 'মুখটি দেখছি বেশ চাঁদপানা।'

'তোমার বোনের থেকেও?' চাঁদ অস্ফুট স্বরে কথাটি বলেই, যতীনের দিকে তাকিয়ে জিভ কাটল।

পরী দৃপ্তচোখে তাকিয়ে বলল, 'কী বললে?'

চাঁদ হাতজোড় করে বলল, 'মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, মাইরি। ক্ষমা করে দাও।'

পরী তথাপি ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'পরী বামনি সত্যি কথা বলতে পেছপা হয় না, বুঝেছ? সে কালোকে কালোই বলে, হীরেকে হীরেই বলে। আমার বোনের সঙ্গে তুলনা দেবার কী আছে, শুনি? আমার বোনের থেকে এ দেখতে অনেক সুন্দর তো বটেই, সে কথা বলব না কেন? তুমি আমার বোনকে বিয়ে করবে না বলে কি আমি মিথ্যা কথা বলব?'

'তুই একটা রাসকেল!' যতীন চাঁদকে ধমক দিয়ে বলল, 'বউদিকে তোর এসব কথা বলতে লজ্জা করে না?'

চাঁদ তখনো পরীর দিকে হাতজোড় করে ছিল, বলল, 'বলছি তো অন্যায় হয়ে গেছে, আর কখনো বলব না।'

বেণুর চোখে তখন কৌতুকের দ্যুতি ঝিকিমিকি করছে, একটা উদ্গত হাসি যেন থমকিয়ে রয়েছে সেখানে। পরী বলল, 'যা খুশি তাই বল, জবাব একদিন পাবে।' বলে বেণুকে বলল, 'তুমি ভাই রূপসী মেয়ে, কেন মিছিমিছি হাত দেখাতে এসেছ? আমিই তোমাকে বলে দিচ্ছি, তোমার খুব ভাল বর জুটবে, কিছু ভাবতে হবে না। আমি বলছি, তুমি সুখী হবে। তবু এসেছ, তখন জ্যোতিষ্ক ঠাকুরের কাছে হাত দেখাও। যাবার আগে একটু চা খেয়ে যেও কেমন?'

বেণু সলজ্জ হেসে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। পরী চাঁদের দিকে এক ঝলক কুপিত দৃষ্টি হেনে, নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। যতীন বেরিয়ে যাবার আগে বলল, 'চাঁদ, আর ঝামেলা পাকাস নি, আমি চললাম।'

চাঁদ বেণুর দিকে তাকাল, সঙ্কোচে হেসে বলল, 'বউদিকে কোন কথা বলে পার পাবার উপায় নেই।'

'উনি কিন্তু মানুষটি ভাল।' বেণু বলল।

চাঁদ বলল, 'তা আর জানি না? একশো ভাগ।'

'তবে ওরকম কথা বলতে গেলেন কেন?' বেণু কৌতুকে হেসে বলল।

চাঁদ একবার পরীর ঘরের দরজার দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ভাল মানুষদের মাথায় কোন কোন ব্যাপারে ছিট থাকে তো। এটা তার প্রমাণ। যদিও কথাটা সত্যি আমার মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেছে।'

বেণু হাসতে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিল, ওর বেলোয়ারি চুড়ির গোছায় ঝনাৎ করে শব্দ হল। বলল, 'উনি বুঝি ওঁর বোনের সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে চান?'

চাঁদ প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে, এক কোণে টেবিল ঘিরে কয়েকটি চেয়ার দেখিয়ে হেসে বলল, 'বসুন। আপনার ছকটা কোথায়?'

বেণু কোমরের কাছে গোঁজা রুমালের পাশ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বলল, 'আমার কথার জবাব দিলেন না কিন্তু। দুই ভাইয়ের বউ দুই বোন তো ভালই, সংসারে শান্তি থাকে।'

'সে-কথা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। দুই বোনই হয়তো বাড়ি ফাটিয়ে—' চাঁদ কথাটা শেষ না করে বউদির ঘরের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি বসুন, আমি কাগজ-কলম নিয়ে আসি।'

বেণু একটা চেয়ারে বসল। তাকাল ঘরের চারদিকে। ওর চোখে-মুখে এক মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠল একটা উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা। চাঁদের ঘরের দরজার দিকে দেখে, পরীর দরজার দিকে তাকাল। ওর চিবুক আর নাকের ডগা ঘেমে উঠছে।

পরী বেরিয়ে এল তার শোবার ঘরের থেকে। ভিতরের অংশে যেতে উদ্যত হয়ে, বেণুকে একলা বসে থাকতে দেখে বলল, 'তুমি একলা বসে আছ? তাও ঠাকুরপো পাখাটা খুলে দিয়ে যায় নি?' বলে সে নিজেই এগিয়ে এসে, পাখার সুইচ টিপে দিল।

বেণু স্বস্তি পেয়েও বলল, 'আমার খুব গরম লাগছে না।'

'তা আমি খুবই বুঝেছি।' পরী হেসে বলল, 'কলকাতায় তোমাদের বাড়ি কোথায়?'

বেণু বলল, 'ভবানীপুর।'

'কবে এসেছ এখানে?'

'কাল।'

পরী বলল, 'আমাদের বাড়িতে যা অবস্থা চলছে, তা আর কহতব্য নয়। শুনেছ বোধহয় যতীন ঠাকুরপোর কাছে?'

'কানপাশার কথা তো?' বেণু বলল।

পরী বলল, 'হ্যাঁ। তাহলে শুনেছ সবই। আমাদের এখন পাগল হতে বাকী আছে। মনে মনে অবাক হয়ে ভাবি, এমন কোন্ মুখপুড়ি মেয়ে আছে, অমন একটা দামী কানপাশা হারিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে?'

'কানপাশাটা খুব দামী বুঝি ?' বেণুর স্বরে গভীর ঔৎসুক্য

পরী একবার চাঁদের ঘরের দরজার দিকে দেখে, গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'মেলাই দামী কানপাশা। এদের আবার ধারণা, কেউ জেনে ফেললে গোলমাল হয়ে যাবে। তা তুমি তো আর কানপাশার খোঁজে আসো নি, তোমাকে বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, এটাও সত্যি কথা, কানপাশার খোঁজে কত মতলববাজ ফেরেববাজ যে এল !' বলে সে আর একবার চাঁদের দরজার দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'সোনার অমন জাফরির কাজ চোখে বড় একটা দেখা যায় না। মাঝখানে একটা হীরে বসানো আছে, খাঁটি হীরে। আমার স্বামী বলেছে, ওটার দামই নাকি কম করে দু গাড়াই হাজার টাকা হবে।'

বেণুর গলা দিয়ে আচমকা একটা শব্দ বেরোল। পরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ?'

বেণু চমকিয়ে ব্যস্ত ভাবে বলল, 'কিছু না, ঢেঁকুর উঠেছে।'

কিন্তু ওর চোখের ব্যগ্র কৌতূহলিত দৃষ্টি ও মুখের ব্যাকুল অভিব্যক্তি অন্যরকম দেখাচ্ছে। পরী বলল, 'দিদির বাড়িতে অবেলায় অনেক ভাল-মন্দ খেয়েছ তো, তাই।'

বেণু বলল, 'কানপাশাটায় কেবল একটা হীরে বসানো ?'

'না, হীরেটার চারপাশে আবার ছোট ছোট মুক্তোও আছে।' পরী বলল।

বেণুর গলায় আবার হিক্কা ওঠার মত শব্দ হল। পরী বলল, 'একটু জল এনে দিই খাও।'

'না না, কোন দরকার নেই।' বেণু বাধা দিয়ে বলল, 'কানপাশাটার কথাই শুনি।'

পরী হেসে বলল, 'তোমারও তাহলে কানপাশার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে ? আর কী বলব বল ? হীরের মত মুক্তোগুলোও খাঁটি, কালচার করা মুক্তো না।'

বেণুর আবার হিক্কা উঠল, তাড়াতাড়ি মুখে হাত-চাপা দিল। পরী

লল, 'সোনার ওপরে যা কাজ—'

'সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।' চাঁদের চিৎকার শোনা গেল, 'কিছুদিন ই কানপাশার হিড়িকে, ঘরের জিনিসপত্র খুঁজেই পাওয়া যায় না।' লতে বলতে ও বেরিয়ে এল।

পরী বলল, 'কী হল ?'

চাঁদের এক হাতে একটা নোটবই আর কলম। অন্য হাতে একটা াই-গ্লাস। বলল, 'কাগজ-পেন্সিল কোথাও খুঁজে পেলাম না।'

'নিজেদের খুঁজে পাওয়াই দায়, তার আবার কাগজ-পেন্সিল!' রী বলে চলে যাবার আগে, বেণুকে বলে গেল, 'বসো ভাই, আসি। রে আমার দেওর কিন্তু একজন খাঁটি জ্যোতিষ।'

চাঁদ মাথার ওপরে বড় আলোটার সুইচ টিপে জ্বালল। উজ্জ্বলতর ালোয় ঘর ভরে উঠল। বেণুর মুখোমুখি চেয়ারে বসে হাত বাড়িয়ে লল, 'দিন, ছকটা দিন।'

বেণু ছকটা দিয়ে বলল, 'এখনো 'আপনি' করেই বলছেন ?'

চাঁদ হেসে বলল, 'নতুন তো। হয়ে যাবে।' বলে কাগজে আঁকা কটা টেবিলের ওপরে পাতল। বেশ খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। বেণু কেবল ঘরের আশে-পাশে দেখছে, আর মাঝে মাঝে চাঁদের নত মুখের দিকে। ওর চোখে-মুখে একটা রুদ্ধ উৎকণ্ঠা এবং ত্রস্ত ব্যাকুলতা।

চাঁদ একটা শব্দ করল, 'হুঁ!'

'অ্যাঁ ?' বেণু চমকিয়ে উঠল।

চাঁদ মুখ না তুলে বলল, 'না, আপনাকে না।' বলে নোটবুকের াগজে, কলম দিয়ে নানান কিছু লিখতে লাগল।

বেণু নিজের দুই করতলে দু হাত চেপে কপালে ঠুকতে ঠুকতে, াদের মুখের দিকে নিবিড় চোখে দেখতে লাগল। যেন ও চাঁদকে ভাল রে মেপে নিচ্ছে, কিন্তু দৃষ্টিতে অন্যমনস্কতা। চাঁদ বলল, 'আপনার কি ুলা রাশি ?'

'অ্যাঁ ?' বেণু আবার চমকানো ভঙ্গিতে শব্দ করল।

চাঁদ মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি অন্যকিছু ভাবছেন ?'

'না তো!' বেণু নিজেকে সামলিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'হ্যাঁ আমার তুলা লগ্ন ?'

'মেষ রাশি।'

'তাই শুনেছি।'

'আপনার বয়স কত ?'

'একুশে পড়েছি।' বলেই আবার বলল, 'আপনি কিন্তু সেই আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করে যাচ্ছেন।'

চাঁদ বলল, 'হয়ে যাবে। এবার দেখি হাত ?'

বেণু বাঁ হাত এগিয়ে দিল। চাঁদ বলল, 'দুটো হাতই পাতুন।'

বেণু দু হাতই পাতল। চাঁদ দেখল, বেণুর মুখে গাঢ় রঙের ছোপ বাঁ হাতের অনামিকায় একটি লোহার রিং। জিজ্ঞেস করল, 'লোহা কবে পরেছেন ?'

'মাস খানেক।' বেণু জবাব দিল।

চাঁদ বেণুর মুখের দিকে তাকাল। বেণু যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে লা হল, দৃষ্টি নত করল। চাঁদ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কে পরতে বলল ?'

'আমার এক বন্ধু—কলেজের বন্ধু।' বেণু বলল, 'কেন বলুন তো ঠিক হয়নি পরা ?'

চাঁদ বলল, 'ক্ষতি কী ? ঘোড়ার ক্ষুরের আংটি খারাপ না, দুষ্ট নজ থেকে রক্ষা করে, দুশ্চিন্তা আর ক্ষতির হাত থেকে একটু আগলে রাখে বলে ও বড় আই-গ্লাস দিয়ে, বেণুর পেতে রাখা দুই করতলের রে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। দু-একবার নানা জায়গায় হাত দি টিপে, ঘষে দেখল। বেশ খানিকক্ষণ দেখার পরে, আই-গ্লাস রেখে সোজা হয়ে বসে বলল, 'এবার কী কী জানার দরকার, শুনি ?'

বেণু ঠিক কী করবে বা বলবে, যেন ভেবে পেল না। হাত দুটো একবার রাখল টেবিলের ওপর, আর একবার কোলে। আঁচল নি

টানাটানি করল কয়েকবার। আর চলন্ত পাখার নিচে বসে, ঘামতে লাগল। খোলা চুল কপালে আর গালে এসে পড়ল। তারপর চাঁদের দিকে তাকাতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে হাসল।

চাঁদের দৃষ্টিতেও কি কিঞ্চিৎ মুগ্ধতার আমেজ লেগেছে? হেসে বলল, 'এত লজ্জার কী আছে? আমিই বলছি, এই বর্ষাতেই আপনার বিয়ে লেগে যাবে মনে হচ্ছে।'

'আমি সে কথা মোটেই জানতে চাইনি।' বেণু লজ্জায় বলে উঠল।

চাঁদ বলল, 'বেশ! আর বর? বড়লোক না হলেও, আপনার বর আপনাকে খুব ভালবাসবে, আপনি সুখী হবেন।'

'না না না, আমি এসবও জানতে চাইনি।' বেণু প্রগাঢ় লজ্জায় বলল, এবং চকিতে ঘরের আশে-পাশে দেখে নিল।

চাঁদ বলল, 'খারাপ আমি কিছুই দেখছি না, তবে পিত্তির ধাতটা ভাল না। এর জন্য আপনি—'

'শুনুন, আমি এসবও জানতে চাইনি।' বেণু এবার নিজেকে যেন একটু স্থির করতে চেষ্টা করল।

চাঁদ বলল, 'তবে খুব হালফিলের একটা কথা আমি বলতে পারি।'

বেণু প্রায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করে বলল, 'সেটা কী?' 'কী, অ্যাঁ?'

'আপনি একটা খুব অ্যাংজাইটিতে আছেন, আপনার ভেতরে বেশ ছটফটানি যাচ্ছে, তাই না?' চাঁদ বলল।

বেণু বলে উঠল, 'সাংঘাতিক! খুব সত্যি কথা। কিসের অ্যাংজাইটি বলুন তো?'

'তা ঠিক করে বলা মুশকিল, তবে আপনি কিছুটা কলঙ্কের ভয়ে আছেন।'

'কলঙ্ক! কিসের কলঙ্ক?' বেণুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল।

চাঁদ বলল, 'সেটা ঠিক বলতে পারব না। যে আপনাকে লোহার

রিং পরতে বলেছে, সে এসব ভেবেই বলেছে।'

'ঠিক বলেছেন, ঠিক।' বেণু ত্বু-হাত এক করে মাথার ওপরে তুলল. আর চুড়িতে ঠিন ঠিন শব্দ বাজল।

চাঁদ বলল, 'তবে ঘাবড়াবেন না। মনে হচ্ছে, আপনার বিয়ে আগেই, মনের এ অবস্থা কেটে যাবে। আপনি শান্তি পাবেন।'

'অসম্ভব!' বেণু বলে উঠল, 'কী করে শান্তি পাব বলুন? আমি তে কোন উপায় দেখছি না।'

চাঁদ বলল. 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আপনার ছক, হাতে রেখা যা দেখলাম, তাতে আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, মনে শান্তি আসবে। মোটের ওপর, আপনার সামনেই সুদিন।'

বেণু হতাশ ভঙ্গিতে বলল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন আপনিই আমাকে একমাত্র রক্ষা করতে পারেন।'

'আমি!' চাঁদ অবাক চোখে বেণুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আপনাকে কী করে রক্ষা করব?'

বেণু বিভ্রান্তভাবে দ্রুত ঘাড় নেড়ে বলল, 'না না, মানে, অন্য কো ভাবে না। একজন জ্যোতিষ হিসাবে, আপনি কি আমাকে একটা প দেখাতে পারেন না?'

'কিসের পথ?'

'ত্বশ্চিন্তা আর মনের কষ্টের হাত থেকে?' বেণু সাগ্রহে চাঁদে মুখের দিকে তাকালো।

চাঁদ বেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে, হৃদয়ের কোথায় একটা স্পন্দ অনুভব করল। বেণুর মুখের উৎকণ্ঠিত অসহায়তা ওকে কেমন বিম করে তুলল। ও বলল, 'তেমন কিছু করবার থাকলে, আমি আপনাকে বলতাম। কিন্তু এখন কিছু করার নেই; তবে আপনাকে আমি বলছি আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার এ অবস্থা কিছুতেই আ বেশিদিন থাকবে না।'

বেণু কোন কথা বলল না, টেবিলের দিকে অপলক হতাশ চো

তাকিয়ে রইল। তারপরে একটা দমকা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'বুঝেছি, আমার ডোবা ছাড়া কোন উপায় নেই।' বলতে বলতে বেণুর কাজল-টানা আয়ত চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল।

চাঁদ একটা ব্যাকুলতা অনুভব করল, বলল, 'আমি অবিশ্যি সব কথা জানি না। কিন্তু ছক আর হাতের রেখা যদি ঠিক কথা বলে, তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি ঠিকই দেখেছি।'

চাঁদের কথা শেষ হবার আগেই, পরী এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে একটি প্লেট নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'কী, জ্যোতিষ কী বলছে?'

'চমৎকার!' চাঁদ বলল, 'খুব ভাল ছক, হাতের রেখাও সুন্দর।'

পরী চায়ের কাপ আর প্লেট নামিয়ে রেখে বলল, 'সে তো আমি আগেই বলেছি। নাও ভাই, এবার একটু চা খেয়ে নাও।'

বেণু বলল, 'কিন্তু বউদি, মিষ্টি এনেছেন কেন? আমি এখন এসব খাব না।'

পরী বলল, 'ভয় নেই গো, এ আমার হাতে-গড়া নারকেলের ছাঁচ। খেলে, অবেলার অম্বল সেরে যাবে। তোমার মুখখানি এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? ঠাকুরপো বুঝি বাজে কথা বলে, মন খারাপ করে দিয়েছে?'

বেণু চাঁদের দিকে তাকিয়ে, লজ্জা পেয়ে হেসে বলল, 'না না, উনি খারাপ কিছু বলেননি, সবই ভাল বলেছেন।'

'কিন্তু ওর ধারণা, খারাপ কিছু আছে।' চাঁদ বলল, 'আমার ভাল কথাটা বিশ্বাস করতে চাইছে না।'

পরী বলল, 'তবে আবার কী। এই নাও, খেয়ে নাও।' বলে নিজেই একটি নারকেলের ছাঁচ তুলে, বেণুর মুখের কাছে ধরল।

বেণু হেসে, ছাঁচ নিজের হাতে নিয়ে, মুখে দিল। বলল, 'ওঁকে কিছু দিলেন না?'

'না। রবিবারে সারা দিনে যে কতবার চা খায় দুই ভাইয়ে!' পরী

বলল, 'সারা দিন আমি কেবল চা-ই করি।'

বেণু বলল, 'কিন্তু বউদি, আমি এতটা চা খাব না।' বলে চাঁদের দিকে একবার তাকালো।

চাঁদ বলল, 'তা হলে আমি একটু প্লেটে করে ঢেলে নিচ্ছি।'

'সেই ভাল।' বলে বেণু নিজেই কাপ থেকে খানিকটা চা প্লেটে ঢেলে দিল।

পরী হেসে বলল, 'জ্যোতিষীর পাওনা দিলে বুঝি?' তারপরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ঝঙ্কার দিল, 'একটু লজ্জাও করে না!'

চাঁদ আর বেণু দুজনেই হেসে উঠল। পরী বলল বেণুকে, 'আমি যাই ভাই, উনোনে আমার রান্না চাপানো আছে। সময় পেলে আবার এসো।' বলে দ্রুতপায়ে চলে গেল।

চাঁদ এক চুমুকেই চা শেষ করে, সিগারেট ধরালো। বেণু নিজের খাবার আর চা খেয়ে বলল, 'এবার তাহলে যাই?'

'আমি পৌঁছে দিচ্ছি।' চাঁদ বলল।

'আমি একলাই যেতে পারব।'

'কলকাতার মেয়ে বলে?' চাঁদ হেসে বলল, 'কিন্তু আমার একটা দায়িত্ব আছে তো। মফস্বল শহরকে এতটা ভয় না পাওয়ার কোন কারণ নেই।' বলে চাঁদ বেণুর ছকটা হাতে নিয়ে বলল, 'এটা নিয়ে যান।'

বেণু হাত বাড়াল। চাঁদ থমকিয়ে গিয়ে, অবাক চোখে ছকটার দিকে তাকাল। ও দেখল, ছকের উল্টো পিঠে আশ্চর্য একটি ছবি আঁকা। পেন্সিলের স্কেচ, কিন্তু কানপাশার ছবিটা চিনতে একটুও ভুল হল না। অবিকল ওর কুড়িয়ে পাওয়া কানপাশার ছবি, ঠিক তেমনি জাফরি কাটা। মাঝখানে হীরে, চারপাশে মুক্তোর বৃত্ত। ও দুই চোখে তীব্র কৌতূহল আর বিস্ময় নিয়ে বেণুর দিকে তাকাল।

বেণুও তাকিয়েছিল। ওর দু চোখেও গভীর অনুসন্ধিৎসা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চাঁদের হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে বলল, 'চলুন।'

'কিন্তু, এর মানে?' চাঁদের স্বরে অপরিসীম বিস্ময়।

বেণু বলল, 'কী বলুন তো ?'

চাঁদ বলল, 'কানপাশার এই ছবিটা ?'

বেণু কিছুটা নির্বিকার স্বরে বলল, 'মানে আবার কী থাকবে ? ওটা একটা কানপাশার ছবি।'

'সেটা তো আমি নিজের চোখেই দেখলাম।' চাঁদ কিছুটা অবাক অসহিষ্ণু স্বরে বলল, 'কিন্তু এই কানপাশার ছবিটা তোমার ছকের পিছনে কে আঁকল ?'

বেণু বলল, 'কেউ হয়তো এঁকেছে। কেন বলুন তো ?'

চাঁদ তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারল না, অপলক তীক্ষ্ণ চোখে বেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর খেয়াল নেই, বেণুকে ও 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে। ওর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, বলল, 'এটা কি যতীন এঁকেছে ?'

'যতীন ? মানে যতীনদা ?' বেণু অবাক স্বরে বলল, 'যতীনদা আমার ছকের এ কাগজ চোখেই দেখেননি।'

'তবে এ কানপাশার ছবি তোমার কাছে এল কেমন করে ?' চাঁদ রীতিমত ঝাঁঝালো স্বরে ধমক দিয়ে বলল, 'এর পেছনে রহস্যটা কী ?'

বেণু ভাঙে তো মচকায় না, বলল, 'একটা কানপাশার ছবিতে আবার রহস্য কী থাকবে, বুঝতে পারছি না তো ?'

চাঁদ হতবাক হয়ে বেণুর দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা মুখে এল না। বেণু চাঁদের চোখের দিকে তাকিয়ে, আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি কি যাব ?'

চাঁদ বলল, 'দাঁড়াও।' তারপরেও একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'বেণু, আমার মনে হচ্ছে, তুমি কিছু একটা চেপে যাচ্ছ। তুমি আমাকে বলতে পার, তোমার ছকের পেছনে, এ কানপাশাটার ছবি এল কেমন করে ?'

'তার আগে আপনি বলুন, কেন এমন করে জানতে চাইছেন ?' বেণু বলল।

চাঁদ বলল, 'তা হলে শোন বেণু, তোমার ছকের পেছনে যে-কানপাশার ছবি আঁকা, তার সঙ্গে আমার কুড়িয়ে পাওয়া কানপাশাটার অদ্ভুত মিল। মানে, একেবারে অবিকল বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই।'

'তা হলে, আপনাকে আমার একটা গল্প বলতে হয়।' বেণু বলল, 'সোজাসুজি বললে, আপনাকে হয়তো বোঝাতে পারব না।'

'তার মানে?'

'তার মানে, আপনাকে আমি একটা ঘটনা বলতে চাই।' বেণু বলল।

চাঁদ বলল, 'তুমি তাহলে ইচ্ছা করেই আমাকে কানপাশার ছবিটা দেখাতে চেয়েছিলে?'

বেণু ঠোঁট টিপে হাসল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। চাঁদের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হতেই, বেণু দৃষ্টি নত করল। চাঁদের মনে বিভ্রান্তির ঝড় বইছে। বেণু জবাব না দিলেও, ও বুঝতে পারল, ছকের পিছনে আঁকা কানপাশার ছবিটা দেখাবার উদ্দেশ্য ওর ছিল। কিন্তু কলকাতার মেয়ে বেণুর সঙ্গে এ কানপাশার কী যোগাযোগ থাকতে পারে? চাঁদের মন যত রহস্যের মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগল, ততই ও ব্যাকুল হয়ে উঠল। বলল, 'বেশ, বল তোমার গল্প।'

'এখানেই বলব?' বেণু একটু দ্বিধা করে বলল, 'বউদি হয়তো আসবেন, ওঁর সামনে আমি কিছু বলতে পারব না। আপনাদের এ শহরে কি নিরিবিলি কোন জায়গা নেই? পার্ক বা ময়দান?'

চাঁদ একটু ভেবে বলল, 'আছে, গঙ্গার ধারে ফাঁকায় গিয়ে বসা যায়। কিন্তু তোমার কি সেখানে যাওয়া ঠিক হবে?'

'কেন ঠিক হবে না?' বেণু অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো আপনার সঙ্গে যাব। একটু নিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসতে পারলে ভাল হয়।'

চাঁদ ব্যস্ত ব্যাকুল হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চল।'

বেরোবার আগে চাঁদ গলার স্বর চড়িয়ে বলে গেল, 'বউদি আমরা বেরোচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দিও।'

চাঁদ বেণুকে নিয়ে এল গঙ্গার ধারের মাঠে। মাঠ ঠিক বলা যায় না, কিছু গাছপালাও আছে, আর পাড় বেশ উঁচু। আকাশে আবছা মেঘের ছায়া থেকে ফিকে জ্যোৎস্নার ফুটে ওঠা আলোকে দেখাচ্ছে অনেকটা কুহেলিকাময়। বাতাস অতি মৃদু, তবু ঘরের ভিতর থেকে এই ফাঁকায় ঠাণ্ডা লাগছে। নদীর ওপারের শিল্প-শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। ফিকে জ্যোৎস্নায় গঙ্গার বুকে দু-একটা নৌকো ভেসে বেড়াচ্ছে।

চাঁদ আর বেণুই শুধু না, দূরে কাছে আরো কিছু কিছু লোক রয়েছে। রাস্তার কাছ থেকে একটি মাত্র আলো বেশ গঙ্গার ধার পর্যন্ত এসেছে। চাঁদ নদীর খুব কাছাকাছি, উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানেই বসা যেতে পারে।'

বেণু ঘাসের দিকে মাথা নিচু করে একবার দেখে, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। চাঁদও বসল, তাকালো বেণুর মুখের দিকে। চাঁদ কোনদিন এরকম একটি মেয়েকে নিয়ে, এমন একটি সময়ে, গঙ্গার ধারে এসে বসেনি। বেণুর মুখে, সপ্তমীর চাঁদের আলো, এবং সারা গায়ে। চাঁদের চোখে বেণুকে কেমন অবাস্তব এক নারীমূর্তি বলে মনে হচ্ছে। বেণুকে ঘিরে যেন একটা অলৌকিক রহস্য বিরাজ করছে।

বেণু চোখ তুলে একবার চাঁদকে দেখল, তারপরে গঙ্গার দিকে মুখ ফেরাল। এখন ওর মুখে হাসি নেই, যেন অনেক দূর থেকে বলল, 'চাঁদ-বাবু, আমি আপনাকে এখন যে-ঘটনাটা বলব, তা বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছা। শুনে আপনি যা-ই ভাবুন, তার আগে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা?' চাঁদের স্বরে ব্যস্ত বিস্ময়।

বেণু চাঁদের দিকে ফিরে বলল, 'আপনি একথা কারোকে বলবেন না। যতীনদাকেও না।'

চাঁদ সহসা কোন জবাব দিতে পারল না। বেণু আবার বলল, 'কারণ, আমি আপনাকে যে ঘটনা বলব, তার সঙ্গে একটি মেয়ের মান-সম্মান জড়িয়ে আছে। এমন কি তার জীবনের বিরাট কলঙ্কও রটে যেতে পারে। এখনো কেউ কিছুই জানে না, আপনিই প্রথম জানবেন। আপনি হয়তো মেয়েটাকে খুব খারাপ ভাবতে পারেন। চোর ভাবতে পারেন, লোভী ভাবতে পারেন, কোন উপায় নেই। কিন্তু কারোকে তা বলতে পারবেন না।'

চাঁদের কৌতূহল আর ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে উঠল, অথচ ঘটনার গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। কোন্ মেয়ের কথা, কেনই বা বেণু বলতে চাইছে, আর তার সঙ্গে কানপাশার ছবিটারই বা কী অর্থ, কিছুই অনুমান করতে পারছে না। বলল, 'ঠিক আছে, আমি কথা দিলাম, কারোকে কিছু বলব না।'

বেণু একাগ্র দৃষ্টিতে চাঁদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতেই বেণু আবার গঙ্গার দিকে মুখ ফেরাল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, বেণু বলল, 'প্রথমেই বলেছিলাম, আমি আপনাকে একটি গল্প বলব। এ গল্পের নায়িকা একটি মেয়ে, ধরুন তার বয়স প্রায় একুশ, এখনো কলেজে পড়ে, তার নাম—' বেণু থামল, এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'যাহোক একটা নাম ধরে নেবেন। মেয়েটির বাবা মারা গেছে ওর ছেলেবেলাতেই। ওর এক দিদি, তিন দাদা। ও সকলের ছোট। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। দুই দাদাও বিয়ে করেছে, ছোট দাদার এখনো বিয়ে হয়নি, সে বেকার। বড় দুই দাদা চাকরি করে, তাদের আয়েই ওদের সংসার চলে। এক সময়ে ওদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। কলকাতার বেশ নামজাদা বনেদী পরিবার, এখন অবিশ্যি নামে তালপুকুর, কিন্তু ঘটি ডোবে না। কিন্তু তালপুকুরটা যতই শুকিয়ে যাক, পুকুরটাকে দেখলে যেমন বোঝা যায়, এককালে সেটা ছিল অনেক বড় আর গভীর,

ওদের বিশাল বাড়িটা দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু শরিকে শরিকে বিবাদ, ভাগাভাগি হতে হতে, এখন পায়রার খোপের মত হয়েছে। তবে সব শরিকের এক অবস্থা না। মেয়েটি যে-শরিকের, তাদের অবস্থা খুব খারাপ, অথচ তাদের পাশের শরিকের অবস্থা আগের থেকেও অনেক ভাল। তাদের বিষয়বুদ্ধি অনেক বেশি। আগের মত, নানা জায়গায় জমিজমার সম্পত্তি তেমন না থাকলেও তারা বিরাট কারবার গড়ে তুলেছে। তার থেকেই কলকাতায় আরো কয়েকটা বাড়ি করেছে, গাড়ি করেছে। আর আমি যে-মেয়েটির কথা বলছি, তারা কেবল পুরনো জিনিসপত্র, অভাবের দায়ে বিক্রি করে দিয়েছে, দিচ্ছে, আর কোনরকমে দুই দাদার আয়ে চালিয়ে যাচ্ছে।' বেণু হঠাৎ থেমে গঙ্গার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনি শুনছেন তো?'

চাঁদ চমকিয়ে উঠে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

বেণু একটু হেসে বলল, 'ভাবলাম, আমি বকে যাচ্ছি, আপনি হয়তো কিছুই শুনছেন না। যাই হোক, তারপরে বলি।...'

বেণুর বিবৃত কাহিনী মোটামুটি এই রকম: পাশের শরিকের বাড়িটি, মেয়েটির আপন কাকার বাড়ি। শরিকের ভাগাভাগি হলেও, এবং মেয়েটি দরিদ্র হলেও, কাকার বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল। দাদা দিদি ভাই বোন বউদিদের সঙ্গে মেলামেশা গল্প করা সবই ছিল।

এখন থেকে দু মাস আগে, মেয়েটি ওর এক খুড়তুতো বউদিব চুল বেঁধে দিচ্ছিল, মেয়েটি নানারকমের চুল বাঁধার আর্ট জানত। তার জন্য ওকে কোন চুল বাঁধার ফ্যাশানের দোকানে যেতে হয়নি, ও অন্যের চুল বাঁধা দেখেই শিখে নিয়েছিল। খুড়তুতো বউদি বা যে কেউ-ই, বিশেষ নিমন্ত্রণে কোথাও গেলে, মেয়েটির ডাক পড়ত চুল বেঁধে দেবার জন্য।

দুমাস আগের এক বিকেলে, মেয়েটি ওর খুড়তুতো বউদির কবরী রচনা করে দিয়েছিল, এবং নিজের হাতে সাজিয়েও দিয়েছিল। বউদিরা বড়লোক, নানান জায়গায় প্রায়ই তাঁদের নিমন্ত্রণ লেগে থাকত। তবে

বউদিরা কেউ-ই তেমন শিক্ষিতা ছিল না, কিন্তু দাদাদের সঙ্গে নানান জায়গায় যাতায়াত করে। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি নানারকমের নিমন্ত্রণে যাতায়াত তো ছিলই। বউদিকে সাজাবার সময়, বউদি আয়রন সেফ্ থেকে তার গহনার বাক্স বের করে দিয়ে বলেছিল, মেয়েটি যেমন ভাল বুঝবে, তেমনি মানানসই করে যেন বেছে বেছে অলঙ্কার পরিয়ে দেয়। এমন নয় কি যে, ঘটনাটা নতুন। আগেও অনেকবার এরকম আয়রন সেফ্ থেকে গহনার বাক্স বের করে, মেয়েটির সামনে খুলে দিয়েছে। অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই ছিল না।

গহনার বাক্সের মধ্যে ছিল, সোনা আর জড়োয়ার নানারকম গহনা, বিভিন্ন রকমের চোখ ভোলানো সেট্। মেয়েটি গহনা নাড়াচাড়া করতে করতে, একসেট্ জড়োয়ার কানপাশা তার চোখে পড়ে। কানপাশা দুটো দেখেই ওর কৌতূহল বেড়ে ওঠে, খুবই চেনা-চেনা লাগে। বউদিকে ও বলেছিল, কানপাশা ও আগে কোথায় যেন দেখেছে।

বউদি হেসে জানিয়েছিল, না চেনার কোন কারণ নেই। কানপাশা দুটো মেয়েটিরই মায়ের। বছর তিনেক আগে, মেয়েটির মেজ বউদির একটি বড় রকমের অপারেশনের সময়, টাকার ভীষণ দরকার হয়। তখন ওর মা পাঁচশো টাকায় এই জড়োয়ার কানপাশা দুটি বিক্রি করে। অর্থাৎ মেয়েটির মা, বউদির জ্যাঠশাশুড়ি, অভাবে নিজের দেওরপুত্রকেই কানপাশা দুটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

মেয়েটিরও তখন মনে পড়ে যায়, মেজ বউদির গল্‌ব্লাডার অপারেশনের জন্য টাকার দরকার হয়েছিল। দুই দাদার পক্ষে অফিস থেকে আর লোন নেবার উপায় ছিল না, কারণ অনেক লোন নেওয়া ছিল। আর নিলে মাসের শেষে বাড়িতে এক পয়সাও মাইনে আসবে না। মেয়েটির মনে পড়েছিল, মায়ের কাছেই সেই জড়োয়ার কানপাশা দুটি ও দু-একবার দেখেছিল। এক-আধবার পরেও ছিল, এবং নিজেকে আয়নার সামনে দেখে কেবল দীর্ঘশ্বাসে ওর বুক ভারি হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে মায়ের হাতে দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ও জানত না,

বউদির গলব্লাডার অপারেশনের সময়, মা সেই কানপাশা দুটোই বিক্রি করে দিয়েছিল। ও ঠিক জানত না, মায়ের কাছে আরো কী কী গহনা অবশিষ্ট ছিল। তবে জানত, এক একটা অভাবের চরম আঘাতের সময় মা তাঁর পুরনো, আগলিয়ে রাখা সম্পদ বিক্রি করে দিয়ে, সংসারকে রক্ষা করতেন। মাঝে মাঝে মেয়েটিকে সখেদে বলতেন, 'তোর যখন বিয়ে হবে, তখন আমি হয়তো একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাব।'

মেয়েটির তাতে কোন আক্ষেপ ছিল না, কারণ ও নিজের পায়ে দাঁড়াতেই মনস্থ করেছিল। তবু মানুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা থাকে। মেয়েদের থাকে গহনার ওপরে। কিন্তু মেয়েটির তেমন দুর্বলতা কখনো দেখা যায়নি। আসলে মেয়েটি হয়তো নিজেকে তেমন জানত না, তা না হলে, বউদিকে সাজাতে গিয়ে, হঠাৎ ওর এমন মতিভ্রম হল কেন ? হঠাৎ কেন ও লুব্ধ হয়ে উঠল কানপাশা দুটো দেখে ? বউদি ওকে এ কথা বলতেও ভোলেনি, 'জ্যাঠাইমা অভাবে পড়ে পাঁচশো টাকায় এমন জিনিস বিক্রি করে দিয়েছেন, এর বাজারদর আরো অনেক বেশি।'

মেয়েটি বউদিকে সাজাবার শেষ পর্বে, নিজের মনকে আর কিছুতেই সামলাতে পারল না। ওকে যেন কেউ জোর করে সম্মোহিত করে দিচ্ছিল, আর কানপাশা দুটো কানে পরা অবস্থায়, আয়নায় ও নিজেকে দেখতে পাচ্ছিল। ও সেই কানপাশা দুটো, বউদির দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে, বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। বউদি তা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। সে বাক্স বন্ধ করে আয়রন সেফ্-এ তুলে রাখল।

মেয়েটির মনে হয়েছিল, দু টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার ওর বুকের মধ্যে গন্-গন্ করে জ্বলছে। একদিকে লোভ, আর অন্যদিকে অপরাধবোধেই ওর বুকের মধ্যে জ্বলছিল। বাড়ি ফিরে মাকে বা কারোকেই ও কথাটা বলতে পারল না। বুঝতে পারল, ও এমন জিনিস চুরি করে নিয়ে এল, যা ও কখনো পরিচিতদের মাঝখানে ব্যবহার করতে পারবে না। অথচ, কানপাশা দুটো বিক্রি করার কথা ও একবারও ভাবেনি।

মেয়েটির পক্ষে কলকাতায় সেই কানপাশা ব্যবহার করার কোন উপায় ছিল না। তবু কলেজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, দু-একবার পরেছে। কানপাশা দুটো যেন ওর কাছে, ছেলেমানুষের অত্যন্ত লোভী খেলনার মত হয়ে উঠেছিল, অথচ সেই খেলনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ওর অপরাধবোধ, এবং সেই সঙ্গে লুকিয়ে রাখার তীব্র সাবধানতা।

কয়েকদিন পরে মেয়েটির হঠাৎ কলকাতার বাইরে যাবার সুযোগ হল। কলকাতার বাইরে ওর এক আত্মীয়-সম্পর্কের দিদির শ্বশুরবাড়িতে ও বেড়াতে গেল, আর সঙ্গে নিয়ে গেল সেই কানপাশা। কিন্তু দিদির বাড়ি পৌঁছবার আগেই, মেয়েটি ওর ভুল বুঝতে পারল। বুঝতে পারল, সেই আত্মীয় দিদির সামনে ও কানপাশা দুটো পরতে পারবে না, তাহলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। ফলে কানপাশা দুটো ওকে লুকিয়েই রাখতে হল।

মেয়েটি এ পর্যন্ত যা করেছিল, একরকম ঠিক ছিল। কিন্তু কলকাতায় ফিরে যাবার দিন, ওর লোভ ওকে চরম একটা শাস্তি দিল। মেয়েটির চুল ছিল খোলা, কান ঢাকা। ও কানপাশা দুটো কানে পরে নিল। আর চুল দিয়ে ঢেকে রাখল। ভগ্নিপতি ওকে স্টেশনে পৌঁছে টিকেট কেটে ট্রেনে তুলে দিল। গাড়ি ছাড়বার পরে, কানের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিতে গিয়ে, টের পেল, একটা কান শূন্য, কানপাশা নেই।

মেয়েটি চলন্ত গাড়িতেই উঠে দাঁড়াল, মনে হল, ও এখুনি ঝাঁপ দেবে। গাড়ির মধ্যে অন্যান্য যাত্রীরা অবাক হয়েছিল। তখন ওর চোখ ফেটে জল আসছে। ও আবার বসে পড়ল। বারে বারে চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে, শাড়ির আঁচল ঝেড়ে নানান ভাবে দেখল। কিন্তু একটি কানপাশা আর পাওয়া গেল না। অন্য কানপাশাটি ও কান থেকে খুলে, শক্ত মুঠোয় চেপে মুঠি করে রাখল, আর লোকজনের সামনে কান্না চাপবার চেষ্টা করতে লাগল।...

চাঁদ এই পর্যন্ত শুনেই, সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠল, 'তোমার ছকের

পিছনে আঁকা কানপাশাই কি সেই কানপাশা ?'

বেণু বলল, 'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি।'

চাঁদ বেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বেণু বলল, 'মেয়েটির ধারণা হল, এ ওর পাপের ফল। ভাবল, এখনো কিছুটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় আছে। তা না হলে হয়তো আরো সাংঘাতিক কোন ক্ষতি হতে পারে। অমঙ্গল হতে পারে ওদের সংসারের। এই ভেবে কলকাতায় ফিরে ও অপেক্ষা করতে লাগল, কবে আবার সেই বউদি ওকে সাজাবার জন্য ডাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই ডাক এল। ও প্রস্তুত হয়েই গেছল। বউদিকে সাজাতে গিয়ে, প্রথম সুযোগেই ও কানপাশাটা বউদির গহনার বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। দিয়েই ওর মনটা যেমন হালকা হয়ে উঠল, তেমনি দু চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। বউদিকে কোনরকমে সাজিয়ে দিয়ে, ও বাড়ি ফিরে, বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ চেপে কেঁদে উঠল।'

বেণুর স্বর বন্ধ হয়ে এল। চাঁদ দেখল, ফিকা জ্যোৎস্নায়, বেণুর চোখের কোণ দুটি চিক চিক করছে। চাদ জিজ্ঞেস করল, 'তারপর ?'

বেণু একটা নিশ্বাস ফেলে, শান্ত স্বরে বলল, 'তারপর, দিন কয়েক আগে মেয়েটি তার সেই মফস্বলের আত্মীয় দিদির কাছ থেকে একটি চিঠি পেল। তার মধ্যে কানপাশার একটা ঘটনাও মজা করে লেখা ছিল। কারণ মেয়েটির জামাইবাবু নাকি তার বন্ধুদের সঙ্গে, কানপাশা পাওয়া নিয়ে একটা কাণ্ডকারখানা লাগিয়ে দিয়েছে।' বেণু থামল।

চাঁদ বিস্মিত রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ছকের পিছনে কি সেই হারানো কানপাশারই ছবি ?'

বেণু গঙ্গার দিকে মুখ করে বলল, 'সে কথা আমি বলতে পারব না।'

'কিন্তু বেণু, মেয়েটি কেন সেই কানপাশা তার বউদির বাক্সে ফিরিয়ে দিল ?' চাঁদ জিজ্ঞেস করল।

বেণু বলল, 'বললাম তো আপনাকে, জ্বালায়। পাপের জ্বালায়। একটি কানপাশা না হারালে, হয়তো মেয়েটি দুটি কানপাশাই ফিরিয়ে দিত। সে বুঝেছিল, ওই কানপাশায় তার কোন অধিকার নেই। তার মা টাকা নিয়ে সেই কানপাশা তারই খুড়তুতো ভাইকে বিক্রি করেছে।'

চাঁদ দেখল, বেণুর দুই চোখের কোণে জলের বিন্দু টল-টল করছে। ওর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা আর আবেগের অনুভূতি জাগল। বলল, 'মেয়েটি যদি এখন সেই কানপাশা ফেরত পায়, সে কী করবে?'

'যেখানকার জিনিস, সেখানেই আবার ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু—' বেণুর স্বর রুদ্ধ হতে হতে ডুবে গেল।

চাঁদ ডাকল, 'বেণু, কিন্তু কী?'

বেণু তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলতে পারল না, নিজেকে সামলিয়ে নিতে একটু সময় লাগল, তারপরে ভেজা ফিসফিস স্বরে বলল, 'কে মেয়েটিকে সেই কানপাশা ফেরত দেবে? কেন বিশ্বাস করবে? প্রমাণ তো চাই। মেয়েটির হাতে তো কোন প্রমাণ নেই।'

চাঁদ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপরে বলল, 'বেণু, যে কখনো সেই কানপাশা দেখেনি, সে কিছুতেই এমন নিখুঁত ভাবে তার ছবি আঁকতে পারে না। এটা তো একটা ছোটখাটো প্রমাণ না।'

বেণু যেন চমকিত বিস্ময়ে চাঁদের দিকে ফিরে তাকালো। চাঁদও তাকিয়েছিল, ওর চোখে ব্যথার সঙ্গে মুগ্ধতা। বেণু হঠাৎ মাথাটা নত করল, দু হাতে মুখ ঢাকল। ওর শরীর কাঁপছে।

চাঁদ বুঝল, বেণু কাঁদছে। ও ডাকল, 'বেণু।'

বেণু নতমুখেই ফিস ফিস করে বলল, 'আপনি যে আমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবেন—'

চাঁদ ঈষৎ হেসে বলল, 'আমি কোথায় বাঁচাচ্ছি। বাঁচাচ্ছে তো তোমার ভাগ্য। তোমার ছক আর হাত দেখে তো আমি আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছি, তোমার মনে কোন কষ্ট থাকবে না, কলঙ্ক হবে না,

তুমি শান্তি পাবে।'

বেণু জল-ভেজা মুখ নিয়ে চাঁদের দিকে তাকালো, মেঘের কোলে রোদের মত ওর চোখে হাসি চিক চিক করছে। ও হঠাৎ হাত বাড়িয়ে চাঁদের পায়ে স্পর্শ করে মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'আরে এ কী করছ!' চাঁদ বেণুর একটা হাত চেপে ধরল।

বেণু বলল, 'কিছুই না, আপনার পায়ে মাথা রাখতে ইচ্ছা করছে। আমি মনের পাপে বড় পুড়ছি, এবার আমার জ্বালা জুড়োবে।'

'আর তোমার এই মনটাই তো সব থেকে বড়।' চাঁদ বলল, 'এমন ভাবে যে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবে, তার কখনো কলঙ্ক হতে পারে না। কিন্তু বেণু, আমাদের বোধহয় অনেক দেরি হয়ে গেছে, যতীনরা নিশ্চয়ই ভাবছে।'

বেণু বলল, 'ভাবুক, তবু আমি তো মুক্তি পেলাম। কিন্তু আমার কথাটা থাকবে তো?'

'কোন কথা?'

'কারোকে একথা বলা চলবে না?'

'তা হলে আর শেষরক্ষা হয় কী করে? এখন যে একটা সত্যের কাছে আমিও দায়বদ্ধ।'

বেণু আবার চাঁদের পা স্পর্শ করতে গেল। চাঁদ ধরে ফেলে বলল, 'না, ওটা থাক। এবার চল। বউদির হাত থেকে কানপাশাটা নিতে হবে।'

বেণু শঙ্কিত স্বরে বলল, 'না না, আজই বউদির কাছ থেকে ওটা নেবেন না। আমার একটা কথা রাখবেন?'

'কী কথা?'

'কানপাশাটা নিয়ে আমাদের কলকাতার বাড়িতে একদিন আসুন না।'

চাঁদ এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'বেশ, তাই হবে। ঠিকানাটা আমাকে

দিয়ে দিও। কিন্তু কী পরিচয়ে তোমাদের বাড়ি যাব?'

বেণু বলল, 'কেন, আমার সঙ্গে তো আপনার পরিচয় আছে। তাছাড়া আপনি যতীনদার বন্ধু। সেই পরিচয়েই যাবেন।'

চাঁদ কয়েক মুহূর্ত চিন্তিত মুখে বেণুর দিকে তাকিয়ে রইল। বেণু তাকিয়ে থাকতে পারল না, লজ্জা পেয়ে মুখ নামাল। চাঁদ বলল, 'যতীনের পিশী শাশুড়ির বাড়ি যাব, তার জন্য একটা কৈফিয়তের দরকার আছে। ঠিক আছে, সে কৈফিয়ত আমি দেব।' বলে ও উঠে দাঁড়াল।

বেণু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার ওজন এখন অনেক বেড়ে গেছে, একটু টেনে তুলুন।'

'তোমার ওজন তো এখন হালকা হবার কথা।' চাঁদ বলতে বলতে ওকে টেনে তুলল।

বেণু বলল, 'আনন্দেও ওজন বেড়ে যায়।

চাঁদ বেণুর মুখের দিকে তাকালো। বেণু আবার লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল। চাঁদ ওর হাত টেনে বলল, 'চল।'

বেণুর হাত ধরে কয়েক পা অগ্রসর হতেই, খোকনের গলা শোনা গেল, 'ছ্যাখ্ শালার কাণ্ড ছ্যাখ্!'

চাঁদ থমকিয়ে দাঁড়াল, বেণুর হাত ছেড়ে দিল। আধো আলো-অন্ধকারের মধ্যেও চার মূর্তিকে চিনতে ভুল হল না। শম্ভুর গলা শোনা গেল, 'এখন আর হাত ছেড়ে দিলে কী হবে, আমরা দেখে নিয়েছি।'

চাঁদ আর বেণু পরস্পরের দিকে তাকালো। বেণুর চোখে-মুখে শঙ্কিত লজ্জা। চাঁদের মুখে সলজ্জ বিভ্রান্তি। যতীন এগিয়ে এসে বলল, 'তোদের ব্যাপার কী? দু'ঘণ্টা হতে চলল, তোদের পাত্তা নেই? হাত দেখে তোরা তো অনেকক্ষণ বেরিয়েছিস, বউদি বলল। ওদিকে আমার বৌ বলল, তোরা আমার ওখানেও যাসনি; ক্লাবেও এলি না।'

'একটু আটকে পড়েছিল কী না, তাই।' নিমাই বলল।

বেণু বলে উঠল, 'যতীনদা, আমারই দোষ। কয়েকটা কথা বলবার জন্য আমিই আপনার বন্ধুকে এখানে টেনে এনেছিলাম।'

'কয়েকটা কথা? এতক্ষণ ধরে?' খোকন বলে উঠল, 'দুটো বেশি কথা থাকলে তো রাত উজাড় হয়ে যেত!'

চাঁদ সঙ্কুচিত হেসে বলল, 'কথাটা তাহলে দুই বাড়িতেই জানাজানি হয়ে গেছে?'

'কেন যাবে না শুনি?' যতীন ঝেঁজে বলল, 'তুমি তো শালা তখন বলনি, জ্যোতিষী করতে তোমরা গঙ্গার ধারে আসবে?'

'ও বাবা! এ জ্যোতিষী সে জ্যোতিষী না।' নিমাই বলে উঠল, 'এ হল কান ফট্‌ফট্‌ শ্রী একশো আট মহারাজজীর ইস্‌পেশাল জ্যোতিষী!'

বেণু হেসে মুখে হাত চাপা দিল। যতীন বেশ ঝাঁঝিয়েই বলল, 'হাসি বের করে দেবে তোমার তিপুদি, বাড়ি চল।'

চাঁদ আমতা আমতা করে বলল, 'যতীন, ইয়ে—মানে, ওর সত্যি সত্যি দু-একটা গোপন আর জরুরী কথা ছিল। বাড়িতে বউদির সামনে অসুবিধে ছিল বলেই, নিরিবিলিতে এখানে এসেছি।'

'নিরিবিলি! আহা, কী মধুর কথা!' শম্ভু বলল, 'অবিশ্যি সে-রকম কথা বলতে হলে তো নিরিবিলিই চাই।'

খোকন বলল, 'তুই শালা থাম্ তো।' বলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা ওকে নিয়ে তুই তো আমাদের বলে, পালেদের ঘেরা মাঠেই বসতে পারতিস। সেখানেও নিরিবিলি ছিল।'

চাঁদ বলল, 'ভেবে বল্ কথাটা। নিরিবিলি কিছুটা আছে, কিন্তু সবাই এমন হাঁ করে দেখত যে, বসাই যেত না।'

যতীন বলল, 'ঠিক আছে, এখন যা হবার তা হবে। বেণু গিয়ে ওর দিদির কাছে কৈফিয়ত দেবে। আর, তুই তোর দাদা-বউদিকে যা বলবার তা বলিস।'

সবাই চলতে আরম্ভ করল। সকলের পিছনে পিছনে, চাঁদ আর বেণু

খানিকটা চোর দায়ে ধরা পড়ার মত চলল। অথচ দুজনের মুখেই সলজ্জ হাসি, দুজনেই দুজনের দিকে বারে বারে তাকালো, আর ওদের হাসি উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল।

বেণুকে নিজের বাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েই, যতীন অন্যমূর্তি ধারণ করল, চাঁদকে বলল, 'শালা তোর ব্যাপার কী বল তো? তুই কি আমার শালীকে ইলোপ করার তালে ছিলি নাকি?'

চাঁদ হেসে বলল, 'যাহ্, আজকাল আবার ইলোপ করা যায় নাকি?'

'আজকাল বিলোপ করা যায়।' খোকন বলল।

সবাই হেসে উঠল। যতীন বলল, 'এদিকে তো দেখি, মেয়ে দেখলে মেনিমুখো হয়ে যাস, এখানে তো অন্যরকম?'

'কোন কোন মেয়েকে দেখলে মেনিমুখোরা সোনামুখো হয়ে যায়।' নিমাই বলল।

চাঁদ বলল, 'সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর্, বেণুর বিশেষ গোপন কথা ছিল। হাত দেখে ওকে কয়েকটা কথা বলেছিলাম, তাতেই ব্যাপারটা ঘটল।'

'কী সেই গোপন কথা, শুনি?' যতীন বলল।

চাঁদ হেসে, মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বলল, 'না ভাই, সে কথা আমি বলতে পারব না, দিব্যি গেলেছি।'

'গা ছুঁয়ে?' শম্ভু বলল।

খোকন বলল, 'এমন দিব্যি গেলেছিস যে, যতীনকেও বলতে পারবি না?'

চাঁদ চুপ করে রইল। যতীন বলল, 'দেখে মনে হল যেন তোর সঙ্গে বেণুর অনেক দিনের আলাপ-পরিচয়। অথচ আজ তোদের কয়েক ঘণ্টা আগে আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। রহস্যটা কী?'

চাঁদ তথাপি কোন কথা না বলে কেবল হাসল। খোকন বলল, 'এখন বুঝ হে রসিক জন, যে জান সন্ধান।'

চাঁদ বাড়ি এসে দেখল, দাদা-বউদি বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে আছে। ওকে দেখেই দাদা বলল, 'যতীনের শালীকে নিয়ে কোথায় গেছিলি তুই? সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে?'

চাঁদ বলল, 'গঙ্গার ধারে।'

'গঙ্গার ধারে?' পরী যেন আঁতকে উঠল, 'নতুন চেনা একটা আই-বুড়ো সোমত্ত মেয়ে নিয়ে গঙ্গার ধারে গেছলে তুমি?'

দাদা বলল, 'তোর সাহস তো কম না?'

'মেয়েটাই বা কী? অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে গেলই বা কেন?'

'সে যা খুশি করুক, ও যাবে কেন?' দাদা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'ও ব্যাটাছেলে, ওর সাত খুন মাপ। কিন্তু মেয়েটা কেন গেল?'

'মেয়েটা জাহান্নামে যাক, ও আমার ভাই। ওর দুর্নামে আমার দুর্নাম।'

'ছেলেদের এ দুর্নামে কিছু যায়-আসে না। মেয়েটাই খারাপ।'

'হোক খারাপ। ও কেন গেছে?'

'মেয়েটাই বা ওকে কেন ফুঁসলেছে?'

'তুমি চুপ কর। আমাকে কথা বলতে দাও।'

'কেন চুপ করব? কথা কি আমারও বলতে নেই? যতীন আসুক'—

'ধুত্তোরি তোর যতীনের নিকুচি করেছে! যতীনের শালী মরুক গে, ও কেন—'

'কেন মরবে? না জেনে-শুনে একটা কথা বললেই হল?'

চাঁদ দেখল, ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত শুরু হয়ে গেল। দুজনের মধ্যে প্রবল তর্ক, তর্ক থেকে অবুঝ বিবাদ লেগে গেল। চাঁদ

বলল, 'শোন শোন, যতীনরা সবাই গঙ্গার ধারে গেছল, বেণুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা হয়েছে, সব ঠিক হয়ে গেছে। এর মধ্যে খারাপ কিছু—'

'চুপ, তুই একটা কথাও বলবি না। তুই যত নষ্টের গোড়া।' দাদা ধমক দিয়ে উঠল।

পরী বলল, 'কেন গেছলে তোমরা গঙ্গার ধারে?'

চাঁদ বলল, 'বেণু বলল, ও আমাদের এখানে কখনো গঙ্গার ধার দেখেনি। তাই গেছল। আমাকে তো জানই, খারাপ কিছু ভাববার কারণ আছে কি?'

দাদার স্বর একটু নরম হল, 'কিন্তু দুর্নামটা?'

'দুর্নাম কে করবে? যতীন? খোকন? শম্ভু, নিমাই? না যতীনের বউ? সবাই তো আমার বন্ধু।' চাঁদ বলল।

দাদা বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু এরকম ঘটনা যেন আর না ঘটে।'

চাঁদ ঘরের মধ্যে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। শুনতে পেল বউদি বলছে, 'তুমি ব্যাপারটা যত সহজ ভাবলে, আমার তা মোটেই মনে হচ্ছে না।'

'তুমি তো কিছুই সহজ দ্যাখ না।' দাদা বলল।

আবার এক প্রস্থ শুরু হল। চাঁদ নিজের ঘরে ঢুকল। ওর চোখের সামনে ভাসছে বেণুর ছবি, কানে বাজছে ওর কথা।

রাত্রে খেয়ে, দরজা বন্ধ করে মশারির মধ্যে শুয়েও, চাঁদ বেণুকে ভুলতে পারল না। বেণুকে ঘিরে অজস্র চিন্তা ওর মাথার মধ্যে আবর্তিত হতে লাগল। তারপরে হঠাৎ মনে হল, বেণুর ঠিকানাটা নেওয়া হয়নি। কাল কি বেণু চলে যাবে? তাহলে ঠিকানা কেমন করে পাওয়া যাবে? যতীনের কাছে কিছুতেই চাওয়া যাবে না।

চাঁদ এই দুশ্চিন্তায় প্রায় ঘুমোতেই পারল না। পরের দিন সকালে উঠেই দাড়ি কামিয়ে চান করে, জলখাবার খেল। জামাকাপড় পরতে পরতে মনে মনে স্থির করল, যাবার সময় যতীনের বাড়ি হয়ে যেতে

হবে। যতীন ভোর সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে যায়। ও চটকলে ওভার-শিয়ারের কাজ করে। ওর বউ তৃপ্তির সঙ্গে দেখা করে, গতকাল রাত্রের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবার অছিলায়, বেণুর ঠিকানাটা নিয়ে নিতে হবে।

চাঁদ বেরোবার আগে বলল, 'বউদি, কানপাশাটা একবার দাও তো!'

বউদি জিজ্ঞেস করল, 'এখন কাজে যাচ্ছ, কানপাশা নিয়ে কী করবে?'

'দাও না একটু, দরকার আছে।'

পরী ঘরের ভিতরে গিয়ে, আলমারি থেকে কানপাশাটা এনে দিল। চাঁদ কানপাশাটা একবার দেখল। বেণুর কথা মনে পড়ে গেল। একটা নিশ্বাস ফেলে কানপাশাটা বুকের ভিতরের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। পরী আকাশ থেকে পড়ে বলল, 'এ কি, তুমি কি ওটা নিয়ে বেরোচ্ছ নাকি?'

চাঁদ বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'হ্যাঁ, ভয় নেই, হারাব না।'

চাঁদ বেরিয়ে যতীনদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখল, বেণু একটা সাইকেল-রিক্সায় করে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। বেণুও চাঁদকে দেখতে পেয়ে বলল, 'এ কি, আপনি এদিকে? আপনার তো সাতটার গাড়িতে কাজে যাবার কথা।'

'যাব তো। কিন্তু তোমার ঠিকানার জন্য আমি যতীনের বাড়ি যাচ্ছিলাম।'

'আর আমি আপনাকে স্টেশনে ধরব বলে ছুটছিলাম।'

'কী করে জানলে, আমি সাতটার গাড়িতে যাই?'

যতীনদার কাছ থেকে কথাটা বের করে নিয়েছি!' বেণু হাসল, বলল. 'তাড়াতাড়ি উঠে আসুন, নইলে গাড়ি ফেল করবেন তো।'

'তোমার সঙ্গে এক রিক্সায়?'

'তাতে কী হয়েছে? আমিও তো ওই ট্রেনেই কলকাতা যাব।'

চাঁদকে রীতিমত বিভ্রান্ত দেখাতে লাগল। তবু ও রিক্সায় উঠে পড়ল। বেণু ওর ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দিয়ে বলল,

'এতে আমাদের বাড়ির ঠিকানা আছে। কবে আসবেন?'

চাঁদ কেবলই রাস্তার আশেপাশে দেখছিল। বলল, 'ভাবছি, আজই একবেলা ছুটি নিয়ে যাব।'

'আহ্! কী মজা!' বেণু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, তারপরে বলল, 'আপনাকে একটা কথা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। কানপাশাটা কোথায় পেয়েছিলেন?'

চাঁদ বলল, 'একটা পোড়ো বাগানে।'

বেণু একটু ভেবে বলল, 'বুঝেছি। যতীনদা আমাকে একটা শর্টকাট রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছল, একটা পোড়ো বাগানের ভেতর দিয়ে।'

'কানপাশাটা এখন আমার কাছে রয়েছে।' চাঁদ বলল, 'দেখবে?'

বেণু চমকিয়ে উঠল, তারপরে বলল, 'না না, এখন আমি ওটা দেখতে চাই না।'

চাঁদ একবেলা ছুটি নিয়ে, দুপুরে ক্যান্টিনে খেয়ে, কলকাতায় গেল বেণুদের বাড়িতে। বেণু বাড়ির যেরকম বর্ণনা দিয়েছিল, বাড়িটি ঠিক সেই রকমই। আগে থেকে বলা ছিল বলে, বেণু বাড়ির সামনেই চাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল। বেণুর সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গিয়ে, চাঁদ বুঝতে পারল, ওর আসার কথা, বেণু আগাম জানিয়ে রেখেছে, অতএব তেমন কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা দেখা গেল না। চাঁদ বেণুর মাকে প্রণাম করল। তিনি সাদরে চাঁদকে ডেকে বসালেন।

বেণুর ভাইপো-ভাইঝিরা চাঁদকে ঘিরে ধরে, অবাক চোখে দেখতে লাগল। বেণুর মা কিছু কথাবার্তা বললেন, সবই সংসারের কথা। চাঁদের বাড়ি আর পরিবারের সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন দু-চার কথা। তিনি

উঠে যেতেই, চাঁদ বুকের ভিতরের পকেট থেকে কানপাশাটা বের করে বলল, 'এটা আগে নাও, আমি আর রাখতে পারছি না!'

বেণু শঙ্কিত চোখে আশেপাশে দেখে, কানপাশাটা নিয়ে নিজের জামার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বলল, 'এর পরে আপনি যেদিন আসবেন, আশা করি, তার মধ্যে যেখানকার জিনিস, সেখানে ফিরিয়ে দিতে পারব।'

চাঁদ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বেণু, পাঁচশো টাকা দিয়ে কি তোমার খুড়তুতো দাদার কাছ থেকে কানপাশা জোড়া কিনে নেওয়া যায় না?'

বেণু অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় পাব আমরা পাঁচশো টাকা?'

চাঁদ চুপ করে রইল, কিন্তু বেণুর মুখ থেকে চোখ সরাতে ভুলে গেল। বেণুর মুখের লজ্জার ছটা লেগে গেল, ও মুখ নামাল।

বিদায়ের আগে চাঁদকে চা আর মিষ্টি একটু খেতেই হল। বেণুর দুই বউদি আর ওর ছোড়দার সঙ্গে আলাপ হল। দরিদ্র বটে, কিন্তু পরিবারটিকে চাঁদের ভাল লাগল। ও বেণুকেও তা বলে গেল। বেণু ওর সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গেল।

এক মাসের মধ্যে চাঁদ কয়েকবার কলকাতায় এল, আর বেণুদের বাড়ি যেতে ভুল করল না। কলকাতার নানান জায়গায় বেণুর সঙ্গে ঘুরে ফিরে, চাঁদ নিজের মনটাকে বুঝতে পারল। অকপটে না হলেও, কথাটা বেণুকে না জানিয়ে পারল না। বেণু ওর লজ্জিত হাসিতেই অকপট হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে বেণুদের বাড়িতেও, সকলের চোখে একটা জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল।

অন্য দিকে, চাঁদের বাড়িতে এবং বন্ধুমহলে অশান্তি। প্রথমতঃ কানপাশাটা চাঁদ কী করেছে, তার কোন জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। ছুটির দিনেও চাঁদ কেন কলকাতায় বেড়াতে যাচ্ছে, তারও কোন হদিস মিলছে না। ওর বন্ধুরা ভাবতেই পারে না, কানপাশাটার কথা চাঁদ ওদের কাছে চেপে যাবে। ওকে ঘিরে সকলের মনে একটা রহস্য জেগে

উঠল, সেই সঙ্গে সবাই ক্ষুব্ধ।

এক মাস পরেই চাঁদ বেণুর দাদাকে ওর মনের কথাটা জানাল। দাদা জানাল মাকে। মা বললেন, তাঁর আপত্তি নেই, বিশেষ করে তাঁর মেয়েরই যখন সম্মতি আছে। ইতিমধ্যে বেণু খুড়তুতো বউদির গহনার বাক্সে কানপাশাটা তুলে দিয়েছিল। চাঁদ একান্তে, বেণুকেও না জানিয়ে বলল, 'পণ নেওয়াকে আমি ঘৃণার চোখে দেখি। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে।'

বেণুর মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ?'

চাঁদ বলল, 'আপনি একজোড়া জড়োয়ার কানপাশা আপনার দেওরের ছেলেকে পাঁচশো টাকায় বিক্রি করেছেন, তাই না ?'

'তুমি সে কথা জানলে কী করে ?'

'আমাকে বেণু বলেছে। তা নইলে কী করে জানব বলুন ?'

মা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'বেণুর বড় পছন্দ ছিল সেই কানপাশা জোড়া। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ও দরিদ্র বিধবার মেয়ে। তুমি ঠিকই শুনেছ।'

চাঁদ বলল, 'এখন কি সেই কানপাশা জোড়া ফেরত পাওয়া যায় না ?'

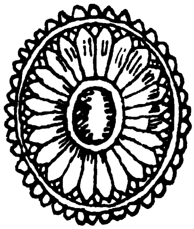
মা বিষণ্ণ বিস্ময়ে বললেন, 'পাওয়া গেলেও আমি পাঁচশো টাকা কোথায় পাব বাবা ?'

চাঁদ বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকলে আমি দেব। বেণুকে তো আমি কিছু দেবই।'

মায়ের দু চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি কথা বলতে পারলেন না, কেবল চাঁদের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। একটু পরে ভাঙা ভাঙা স্বরে বললেন, 'চাঁদ, বেণুর ভাগ্য, ও তোমার মত স্বামী পাচ্ছে। আজ ওর বাবা বেঁচে থাকলে, একথা শুনে সব থেকে খুশি হতেন।' বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চাঁদ, আমি বাঁধা-ধরা নিয়ম মানি না। বেণুর বরকে আশীর্বাদ করব বলে, ওর বাবার একটি আংটি শেষ সম্বল রেখে দিয়েছিলাম। শুভ অশুভ জানি না, আমি আজ

তোমাকে সেই আংটি পরিয়ে দেব।'

চাঁদের কোন আপত্তি না শুনে, তিনি সেই আংটি পরিয়ে দিলেন চাঁদের আঙুলে। চাঁদ দেখল, প্রায় দশ রতির একটি পীত পোখরাজের ভারি আংটি। মনে মনে ভাবল, এই আংটিই কোষ্ঠি অনুযায়ী ওর একটা দরকার ছিল।



বিস্ময় দেখা দিল দুই বাড়িতে। চাঁদের এবং যতীনের। সম্মতি এবং সংবাদের জন্য, বেণুর মায়ের চিঠি এসেছে দুই বাড়িতেই। চাঁদের দাদার কাছে, আর যতীনের কাছে রহস্য ঘেরা বিস্ময়ের একটা ঢেউ লেগে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে কারোর বাকী রইল না।

দাদার সঙ্গে লেগে গেল বউদির। বউদি নাকি আগে জানলে মেয়েটাকে বাড়িতেই ঢুকতে দিত না। দাদা বলল, ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করব, অথচ বিয়ে করব না, এমনটি হলে ভাইয়ের মুখ দেখতাম না। আর যতীন আর ওর স্ত্রী বলল, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া?

কিন্তু কানপাশাটা কোথায় গেল?

চাঁদ সেই জবাবটা দিতে পারল না। ওর ভবিষ্যৎ ঘোষণা অনুযায়ী, শ্রাবণের ভরা বর্ষায়, বেণুর বিয়ে ঠিকই হল, ওর সঙ্গে। নববধূ যখন বাড়ি এল, পরী বেণুকে দু হাতে জড়িয়ে, শাশুড়ির জন্য কেঁদে উঠল। তবু বেণুর গালে চুমো খেয়ে বলল, 'মুখপড়ি, আমার দেওরকে তুই সেই রাত্রেই গঙ্গার ধারে নিয়ে বশ করেছিলি।'

বউভাতের রাত্রে দেখা গেল, বেণুর কানে সেই কানপাশা। ঘরের মধ্যে, চাঁদ নিজের হাতে, বেণুকে হতবাক করে পরিয়ে দিল দুই কানে,

আর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'শক্রুরের চোখে ছাই পড়ুক, আর যেন না হারায়!'

বেণু হাসতে গিয়ে, কেঁদে উঠল। চাঁদের বুকে মাথা রেখে বলল, 'এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে?'

'আমার শাশুড়ির জিনিস, আমার শাশুড়িকে দিয়েই কিনিয়ে নিয়েছি। তোমাকে আমি এ দুটো দিলাম বেণু। এই আমার আনন্দ, আমার সুখ।'

বেণুর দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেল কিন্তু মুখে ওর পরম সুখের হাসি।

তারপরেই হুলুস্থুল পড়ে গেল, দাদা বউদি আর বন্ধুদের মধ্যে। বেণুর কানে পাশা দুটো দেখে এদের মাথাই খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। কোথা থেকে এল এই কানপাশা? এ কানপাশা কার?

চাঁদ বলল, 'এ কানপাশা বেণুরই। ওর দাদাকে জিজ্ঞেস কর।'

বেণুর দাদাও অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এ কানপাশা আমার মায়েরই ছিল। কিন্তু এ তো আমার খুড়তুতো ভাইকে বিক্রি করা হয়েছিল, বেণুর কানে কী করে এল?'

সবাই চাঁদ আর বেণুর দিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকালো। চাঁদ আর বেণু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল। চাঁদ বলল, 'সে কথা এখন বলা যাবে না। তবে বেণুর খুড়তুতো দাদার কাছ থেকে এই জোড়া কেনা হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে নিমন্ত্রিত লোকজনেরা এসে গেছে, আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়।'

বলেই চাঁদ অন্য দিকে সরে গেল। সকলের হতভম্বতার মাঝখানে বেণু বলে উঠল, 'এটা আসলে হারিয়ে পাওয়া। গল্পটা পরে শোনাব।'

তারপরেই উৎসবের আনন্দে সবাই মেতে গেল।

শেষ